মানুষের ইতিহাস

মধ্য যুগ
প্রথম অংশ

নূরুন নাহার বেগম

মানুষের ইতিহাস

মধ্যযুগ

প্রথম অংশ

(মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস)

সাবিনা

নূরুন নাহার বেগম

লেখা প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৩

প্রকাশক : আবদুল হালিম
লেখা প্রকাশনী
৫, এ কে .সন লেন,
ওয়ারী, ঢাকা-৩

প্রচ্ছদ শিল্পী : রুহুল আমিন

মুদ্রণ : বাংলা একাডেমী মুদ্রণ শাখা, ঢাকা
ও প্যাপিরাস প্রেস
১৪/এ, কাঠেরপুল লেন,
বানিয়ানগর, ঢাকা-১

বাঁধাই : আবুল হোসেন এণ্ড সন্স
১, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন,
ঢাকা-১

পরিবেশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
১০. পুরানা পল্টন, ঢাকা

মূল্য ·

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আজীবন সত্যের সন্ধানী,
বহু ভাষাবিদ ও জ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক,
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ,
মানব ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানী,
প্রখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'ক্রুসেড ও জেহাদ'-এর প্রণেতা
আমার পিতামহ
মরহুম মৌলবী দীন মহম্মদ (১৮৫৩-১৯১৬ খৃঃ)-এর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ-চিত্র পরিচিতি

প্রচ্ছদে ছাপা চিত্রটিতে মধ্যযুগের ইউরোপের গ্রামীণ জীবনের ছবি দেখান হয়েছে। ছবিতে হালচাষ, গম ভাঙানো প্রভৃতি কাজের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে; নীচে ডান দিকে দু'জন খৃস্টান সন্ন্যাসী দরিদ্রদের মধ্যে রুটি ও ঝোল বিতরণ করছেন। এ চিত্রটি মধ্যযুগের একজন ইউরোপীয় শিল্পীর আঁকা ছবির প্রতিকৃতি। শিল্পী এখানে একটি ছবির মধ্যেই গ্রামীণ জীবনের সমগ্র কার্যকলাপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের সমসাময়িক চিত্র থেকে ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন।

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ (যুগ্ম লেখক)

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (যন্ত্রস্থ)

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানুষের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ) প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ছয় বছর আগে। নানা কারণে এ গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব ঘটল। পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যযুগের পৃথিবীর ইতিহাস বিবৃত করা হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশরূপে শুধুমাত্র মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস প্রকাশ করা সম্ভব হল। এ অংশে মধ্যযুগের ইউরোপের ধারাবাহিক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরা হল। ইউরোপ ব্যতীত অবশিষ্ট পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যযুগের ইতিহাস 'মানুষের ইতিহাস'-এর পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হবে। 'মানুষের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডের রচনায় বর্তমান লেখিকার সাথে অধ্যাপক আবদুল হালিমও যুগ্ম লেখক হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান খণ্ডটি শুধুমাত্র আমার রচনা হলেও এটি প্রথম খণ্ডেরই অনুসৃতি।

'মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে ইউরোপে রোমান সভ্যতার অবসান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে। রোমান সভ্যতার অবসানের সাথে সাথে প্রাচীন দাসভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থারও অবসান ঘটে। তার স্থলে উদিত হল স্বতন্ত্র আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা। এ নতুন ব্যবস্থার নাম সামন্ত ব্যবস্থা। প্রাচীন যুগের সমাপ্তিতে যে যুগের সূচনা হল আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা তার নামকরণ করেছেন 'মধ্যযুগ'। মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক যুগের শুরু। ইতিহাসের এই যুগ বিভাজন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। কখন প্রাচীন যুগের অবসান ঘটল এবং মধ্যযুগের সূচনা হল, আবার কোথায় এবং কোন সময় থেকে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে আধুনিক যুগের যাত্রাপথ তৈরী হল এ নিয়ে বিতর্কের মীমাংসা এখনও হয়নি। আমরা সেই বিতর্কের মধ্যে

www.pathagar.com

প্রবেশ না করে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সাথে একমত হয়ে ৪৭৬ সালকেই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কাল হিসাবে ধরে নিয়েছি। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে পুরো পশ্চিম ইউরোপ বর্বর জার্মান জাতিদের দ্বারা অধিকৃত হল। শুধুমাত্র রোমের সিংহাসনে একজন সম্রাট তখনও টিকে রইলেন। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বর্বরদেরই এক শাখা ভ্যাণ্ডালদের নেতা অডোএকার রোমের শেষ সম্রাট রোমিউলাস অগাষ্টাসকে সরিয়ে দিয়ে রোমের সিংহাসন দখল করে নিল। রোম সাম্রাজ্যের অবসান প্রকৃত পক্ষে আগেই ঘটেছিল, এখন শেষ চিহ্ন টুকুও অবলুপ্ত হল। শুধুমাত্র পূর্বদিকে কনষ্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে টিকে রইল পূর্ব রোমান বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। নামে রোমান সাম্রাজ্য হলেও প্রকৃত পক্ষে গ্রীক সভ্যতার সর্বশেষ ঐতিহ্যটুকু ধারণ করেই এ সাম্রাজ্য ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

এদিকে বর্বরদের দ্বারা অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপ নিমজ্জিত হল গাঢ় অন্ধকারে। কোন কোন ঐতিহাসিক এ যুগের নাম দিয়েছেন 'তমসার যুগ' বা 'অন্ধকার যুগ'। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। বর্বরদের আক্রমণে রোমানদের সৃষ্ট নগরসমূহ এবং সেই সাথে রোমান কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। গ্রীক ও রোমান ঐতিহ্যের সকল চিহ্ন অবলুপ্ত হল। বর্বরগণ প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তারা যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে সভ্যতার সকল চিহ্ন প্রায় মুছে ফেলে। বর্বরদের এই ধ্বংস লীলা মানুষের জন্য ডেকে আনে চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তা। সর্বত্র ধ্বংসের চিহ্ন পরিস্ফুট। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী চলল এ অবক্ষয়।

কিন্তু মধ্যযুগের এটা একপৃষ্ঠের দৃশ্য। অন্য পৃষ্ঠটি কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার নয়। রোমানদের সভ্যতার পচন অনেক পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। সে সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে বর্বর জার্মানরা বরং প্রগতির পথকেই প্রশস্ত করেছিল। ঘুনে ধরা ক্রীতদাস ব্যবস্থা বর্বরদের আক্রমণেই ভেঙ্গে পড়ে। অগণিত মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে এক অর্থে মানবতার অবমাননার অবসান ঘটান হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে দাসভিত্তিক আর্থ

www.pathagar.com

সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তে যে নতুন সামন্ততান্ত্রিক আর্থ সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল তা লৌহযুগের অবরুদ্ধ কলাকৌশলের সফল প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করেছিল। সামন্ত প্রভুদের দুর্গগুলিই শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছিল।

মধ্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্য নতুন আঙ্গিকের রূপ নেয়। ইউরোপে মধ্যযুগের ভাবাদর্শ তৈরী করেছিল খৃষ্টধর্ম। ধর্মগুরু পোপের বিশাল ছত্রচ্ছায়াতেই সমগ্র ইউরোপ এক শান্তির পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। মধ্যযুগে পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীনে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ যুগে পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলামী সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকাতেও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ সকল সভ্যতার পরিচয় মানুষের ইতিহাসের মধ্যযুগের দ্বিতীয় অংশে প্রদত্ত হবে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, ভারতবর্ষ, চীন ও ইসলামিক দেশগুলি থেকে বাণিজ্যিক পণ্য ছাড়াও সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা উপকরণ ও ভাবধারা সংগ্রহ এবং আত্মস্থ করে মধ্যযুগের ইউরোপের সভ্যতা পরিপুষ্ট হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে নতুন করে গড়ে ওঠে পশ্চিম ইউরোপের নগরসমূহ। এগুলিকে কেন্দ্র করে পুনরুজ্জীবিত হয় ব্যবসা বাণিজ্য। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার সৃষ্টি করে বার্গার শ্রেণী। নতুন যুগের বার্তা বহনকারী এ বার্গার শ্রেণীই শেষ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতাকে মধ্যযুগের গণ্ডী অতিক্রম করে আধুনিক যুগের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়। মধ্যযুগের সামন্ত অর্থনীতির পরিবর্তে এই আধুনিক যুগে উদিত হয় পুঁজিবাদী আর্থ-সমাজ ব্যবস্থা। মানুষের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে (আধুনিক যুগ) পনের শতকের পরবর্তী কালের ইতিহাস বর্ণিত হবে।

নূরুন নাহার বেগম

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

নীচের পুস্তকসমূহ থেকে বিশেষভাবে সাহায্য নিয়ে বর্তমান গ্রন্থটি লেখা হয়েছে :

G. B. Adams, *Civilization during the Middle Ages*, New York.

Thompson, J W., *History of the Middle Ages, 300—1500*, London.

H W. C. Davis, *Medieval Europe*, London.

Edward Mc Nall Burns and Philip Lee Ralph, *World Civilizations*, Vol-1, New York.

Oliver J Thatcher and Ferdinand Schwill, *A General History of Europe*. London.

Oman Charles, *The Dark Ages*, London.

T. F. Tout, *The Empire and the Papacy, 918—1273*, London.

James Bryce, *The Holy Roman Empire*, New York.

E. C. Lodge, *The End of the Middle Ages*, London.

Sidney Painter, *A History of the Middle Ages : 284—1500*

আবদুল হালিম, ইউরোপের ইতিহাসের রূপরেখা, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস ১

ইউরোপে বর্বরদের অভিযান ১

জার্মানদের পরিচিতি ।। জার্মান জাতির মহাঅভিযান ।। জার্মান অভিযানের প্রাথমিক ফলাফল ।।

জার্মানদের রাজ্য স্থাপন ১০

গথ জাতির ইতিহাস ।। ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস ।।

খৃষ্টধর্মের আবির্ভাব ১৬

পোপতন্ত্রের উৎপত্তি ।।

সন্ন্যাসবাদ বা মঠতন্ত্র ২৩

ফ্রাঙ্কদের পরবর্তী ইতিহাস ২৮

জার্মান জাতির অবদান ৩৩

নর্মান জাতির আক্রমণ ৩৬

সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ৪২

সামন্ততন্ত্রের পরিচয় ।। সামন্ত প্রথার উৎপত্তির কারণ ।। সামন্ত-যুগের কৃষকদের অবস্থা ।। সামন্ত প্রভুদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি ।। সামন্ত অর্থনীতির রূপ ।।

সামন্ত প্রথায় চার্চের ভূমিকা ৫৭

সম্রাট ও পোপের সংঘর্ষ ।।

পরিণত সামন্ততন্ত্র ৬৩

শহর সমূহের উৎপত্তি ।। গিল্ড প্রথা ।। বার্গার শ্রেণী ।।

ক্রুসেড ৬৯

সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ৭৬

ইউরোপে কৃষক বিদ্রোহ ।।

www.pathagar.com

ইউরোপে রাজশক্তির উদ্ভব ৮৪
বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ॥ ফ্রান্সে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ॥ শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ॥ ইংল্যাণ্ডে রাজশক্তির অভ্যুদয় ॥ ইতালী ও জার্মানীর রাজনৈতিক অনৈক্য ॥ জার্মানীর রাজনৈতিক অনৈক্য ॥

সামন্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ১০৩

সামন্ত প্রভুদের আচরণ বিধি : শিভালরী ১০৩

মধ্যযুগের চিন্তা ও দর্শন ১০৭

মধ্যযুগের সাহিত্য ১১৫

মধ্যযুগের শিল্পকলা ১১৯
রোমানেস্ক স্থাপত্য ॥ গথিক স্থাপত্য ॥ রঙিন কাঁচের জানালা ॥ চিত্রকলা ॥ সঙ্গীত ॥

মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা ১২২
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উৎপত্তি ও বিকাশ ॥

মধ্যযুগের বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা ১২৭
বিজ্ঞান ॥ মধ্যযুগের কারিগরিবিদ্যা ॥

মধ্যযুগের বাণিজ্য ১৩১
হেনসিয়াটিক লীগ ॥ বাণিজ্য মেলা ॥ বাণিজ্যপথ ॥ ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ ॥ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ ॥ ইউরোপের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ ॥

বাইজেণ্টাইন সভ্যতা ১৪৭
বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের বৈভব ॥ বাইজেণ্টাইন সভ্যতার অবদান ॥ ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও আইন ॥ বাইজেণ্টাইন সভ্যতার বিকাশের কারণ ॥ বাইজেণ্টাইন সভ্যতার অবসান ॥

মধ্যযুগের অবসান ১৬৮

www.pathagar.com

ইউরোপের মধ্যযুগের কারিগরদের কাজের দৃশ্য।
দর্জি, জুতা নির্মাতা, রুটি নির্মাতা এবং তাঁতীদের পেশাগত কাজে নিয়োজিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এ ছবিগুলি মধ্যযুগের শিল্পীদের আঁকা চিত্রের প্রতিকৃতি। এ ধরনের চিত্র থেকেই মধ্যযুগের জীবন যাত্রা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। (পৃ: ৬৩-৬৭)

www.pathagar.com

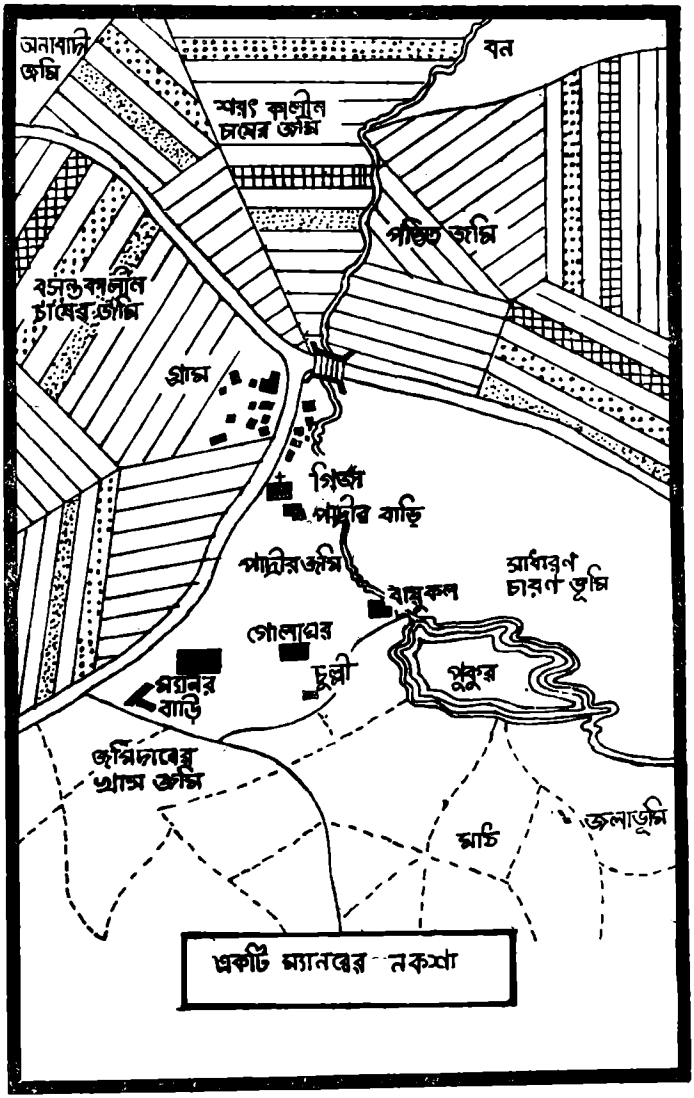

মধ্যযুগের ইউরোপের ম্যানর-এর একটি নক্‌শা।

ম্যানরের (Manor) মধ্যে থাকত চাষীদের গ্রাম, চাষের জমি, জমিদারের দুর্গ ও খাস জমি, গীর্জা, পানিকল বা বায়ুকল, গম ভাঙানোর কল, কাঠচেরাই-এর কল প্রভৃতি। (পৃঃ ৪৪-৪৫)

www.pathagar.com

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস

ইউরোপে বর্বরদের অভিযান

জার্মানদের পরিচিতি

জার্মান বর্বর জাতিদের আক্রমণে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের নগর ভিত্তিক সভ্যতার ধ্বংসের পর ইউরোপে মধ্যযুগের ইতিহাসের সূচনা হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে রোমান জনসাধারণ ও জার্মান বর্বরদের সংমিশ্রণে ক্রমশ গ্রামভিত্তিক সামন্ত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

বর্বরগণ রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে দানিয়ুব নদীর অপর পারে বাস করত। এরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। রোমানদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল পশ্চিম ইউরোপের কেল্টিক ও মধ্য ইউরোপের জার্মানরা। কালক্রমে কেল্টিকরা জার্মানদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এরা জার্মানদের মধ্যেই মিশে যায়। কেল্টিকদের বংশধরদের মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে আইরিশ, স্কট, ওয়েলস ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রিটন প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হয়।

জার্মানগণ প্রথমতঃ রাইন ও ওডার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। তাদের পূর্বদিকে ছিল লিথুয়ানিয়ান, ফিন ও বিভিন্ন প্রকার শ্লাভ জাতির বাসভূমি। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এরা মিলিতভাবে জার্মানদের পশ্চিম দিকে ক্রমশ চাপ দিতে থাকে; এদের ক্রমবর্ধমান চাপের ফলেই জার্মানরা ক্রমশ রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে।

জার্মান জাতির আদি ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের প্রধানতঃ দু'টি প্রামাণ্য দলিলের উপর নির্ভর করতে হয়ঃ একটি, রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজারের দিনপঞ্জি কমেন্টারিজ' (commentaries) এবং অন্যটি বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ 'জার্মানিয়া' (Germania)।

জুলিয়াস সীজারের বিবরণ অনুযায়ী খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জার্মানদের প্রধান পেশা ছিল মাছধরা, পশু শিকার ও পশু পালন এবং সীজারের মতে

www.pathagar.com

কৃষিকার্যের দিকে তাদের তেমন কোন নজর ছিল না। তাদের জীবনযাত্রার মান রোমানদের অপেক্ষা অনেক নীচু ছিল। স্বভাবের দিক দিয়ে তারা ছিল দুর্ধর্ষ এবং দস্যুবৃত্তি ও পররাজ্য আক্রমণ তাদের পেশারই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জার্মানদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল গোষ্ঠীভিত্তিক। ভূমির মালিকানা ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাতে। গোষ্ঠীর সদস্যগণ একত্রে জমি চাষ করত এবং সমানভাবে ফসলের ভাগ পেত। পরবর্তী দেড়শ বছরে কৃষিকার্যই জার্মানদের প্রধান জীবিকায় পরিণত হয়।

আবাদী জমি ক্রমশঃ বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তিন পুরুষ পর্যন্ত এক একটি পরিবারের মাপকাঠি ধরা হত। পরিবারের সদস্যগণ একত্রে জঙ্গলাকীর্ণ জমি পরিষ্কার করে সেখানে চাষাবাদ করত, যদিও পশুচারণভূমি, বন ও জলাভূমি ছিল সাধারণের সম্পত্তি। প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই জমির উর্বরতা শক্তি কমে যেত, ফলে তারা সে জমি পরিত্যাগ করে অন্যত্র নূতন ভূমির সন্ধানে গমন করত। এভাবে যাযাবরের মত নতুন আবাদযোগ্য ভূমির সন্ধানে তারা রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। রোমানদের সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং তাদের উন্নততর সভ্যতা জার্মানদের বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে।

জার্মানদের সভ্যতা ছিল গ্রামভিত্তিক। জীর্ণকুটীরে অত্যন্ত দীনহীনভাবে তারা জীবনযাপন করত। নবোপলীয় সমাজ ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে তারা অগ্রসর হতে পারেনি। গ্রামগুলি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন কমিউনের লোকদের বাসভূমি হিসাবে। কমিউনের লোকজন যদিও প্রথমদিকে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, পরবর্তীকালে এদের মধ্যে শ্রেণীবিভেদ দেখা দেয়। গোষ্ঠীপতি ও সামরিক নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ চাষের জমির মালিক হয় এবং গবাদিপশু ও ক্রীতদাসদের একটি বিরাট অংশ এদেরই হাতে আসে। জার্মানদের মধ্যে দাসপ্রথার প্রচলন থাকলেও তাদের অর্থনীতি দাসভিত্তিক ছিল না। ক্রীতদাসগণ প্রভুর সাথেই থাকত, তার কাজকর্মে সহায়তা করত এবং রোমান ক্রীতদাসদের অপেক্ষা অনেক ভাল ব্যবহার পেত। জার্মানরা তাদের ক্রীতদাসদের চাষের জমি ও থাকার জন্য বাসগৃহ দিত, বিনিময়ে দাসদের কাছ থেকে ফসলের অংশ পেত। এক কথায়, ক্রীতদাসদের অবস্থা ছিল রোমের 'কলোনি'দের মত।

www.pathagar.com

জার্মান কমিউনগুলি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হত। প্রতিনিধিরা গণপরিষদ গঠন করত এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। অনেকক্ষেত্রে গণপরিষদ বিচার বিভাগের কার্যও পরিচালনা করত। জার্মানদের মধ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না এবং তাদের কোন রাজাও ছিল না। গোষ্ঠীর স্বাধীন নাগরিকরা তাদের নেতা নির্বাচিত করত কিন্তু তার অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের অস্ত্র বহন করার অধিকার ছিল এবং যুদ্ধে যোগদান করা আবশ্যিক ছিল। অপেক্ষাকৃত ধনী ও ভূস্বামীগণ নিজস্ব সৈন্য মোতায়েন করত এবং তাদের সাহায্যে প্রতিবেশী গোত্রগুলির উপর অবিরাম আক্রমণ চালাত।

এ সকল ভূস্বামীরা সৈন্য সংগ্রহের সময় তারা কোন গোষ্ঠীভুক্ত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র নজর দিত না। এর থেকে মোটামুটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে জার্মানদের আদিম গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ধীরে ধীরে অবসান ঘটছিল।

কখনও কখনও কোন সামরিক নেতা তার অধীনে কয়েকটি গোত্রকে একত্রিত করে ব্যাপকভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর অভিযান পরিচালনা করত। খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানরা এ ধরনের সামরিক অভিযান প্রায়শঃই পরিচালনা করে। ইতিহাসে এ অভিযান জার্মান জাতির মহাঅভিযান নামে পরিচিত।

জার্মান জাতির মহাঅভিযান

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জার্মানগণ বিভিন্ন শাখায় যথা : স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, ভাণ্ডাল, গথ, ফ্রাঙ্ক, লম্বার্ড, আলেমানি, বার্গেণ্ডিয়ান, ফ্রিজিয়ান, অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ শতাব্দীতেই তাদের প্রথম অভিযান শুরু হয়। বন্যা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাদের নিজ দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। স্বভাবতই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় উর্বর ও শস্যসমৃদ্ধ রোমান অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর। অতএব দলে দলে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। এরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম দল দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয় দল বা গথরা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণ সাগরের

www.pathagar.com

তীরে বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে প্রথম দল বা পশ্চিম জার্মানদের বিরুদ্ধে রোমান সেনাপতি মেরিয়াস, জুলিয়াস সীজার, ড্রেসাস, টাইবেরিয়াস ও জার্মানিকাস প্রমুখ যুদ্ধ করে এদের অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভ্যারাস-এর যুদ্ধে এদের হাতে রোমান সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর রোমানরা জার্মানদের বিরুদ্ধে জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করে সীমান্ত বরাবর মজবুত প্রাচীর তুলে বর্বর আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও জার্মানদের অভিযান ঠেকানো গেল না। এর পরবর্তী দু'শ বছরে তারা ক্রমে ক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে অনুপ্রবেশ করে রোমানদের মধ্যে মিশে যায়। এদের শৌর্য ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে কোন কোন রোমান সম্রাট জার্মানদের সেনা বাহিনীতে নিয়োগ করেন এবং তাদেরই সাহায্যে পরবর্তী জার্মানদের আক্রমণ প্রতিহত করেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই সত্যিকার অর্থে জার্মান আক্রমণ শুরু হয়। অভিযানকারীদের দ্বিতীয় দল অর্থাৎ গথরা এবার আক্রমণে অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করে। গথরা দুভাগে বিভক্ত ছিল—অষ্ট্রগথ, যারা কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে বাস করত এবং ভিসিগথ, যারা নিম্ন দানিয়ুবের উত্তরাঞ্চল অধিকার করেছিল। ভিসিগথরাই প্রথম সফলভাবে রোমান সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায়। তারা ডেসিয়া প্রদেশ দখল করে দেয়। রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস তাদের বাধা প্রদানে ব্যর্থ হয়ে ভিসিগথদের সেখানে বাস করার অনুমতি দেন এবং ডেসিয়া থেকে রোমান শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন।

এর পরবর্তী বছরগুলিতে রোমান ও জার্মানগণ কখনও যুদ্ধরত অবস্থায় কখনও শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করতে থাকে। এ সময়েই গথরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু তারা আরিয়ান মতবাদ গ্রহণ করার ফলে পোপ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভিসিগথদের উপর এক মহাদুর্যোগ নেমে আসে। মধ্য এশিয়া থেকে আগত দুর্ধর্ষ হুন জাতি পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের গথদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালনা করে। হুনরা অন্যান্য বর্বর জাতিদের তুলনায় অধিকতর হিংস্র ও শক্তিশালী ছিল। তারা শুধু বর্বরই নয়, সভ্যতার লেশমাত্র তাদের মধ্যে ছিল না।

অসভ্য, বন্য এই জাতির আক্রমণে গথরা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। ৩৭৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রোমান সম্রাটের অনুমতিক্রমে ভিসিগথরা দানিয়ুব নদী

www.pathagar.com

অতিক্রম করে রোমান রাজ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে। কিন্তু কালক্রমে রোমান অফিসারদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

রোমান অফিসাররা তাদের উপর শুধু অত্যাচারই করত না, তাদের স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করত। ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে আদ্রিয়ানোপোলের যুদ্ধে ভিসিগথরা রোমানদের পরাজিত করে। বাইজেন্টাইন সম্রাট তখন তাদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং তাদের কিছু সংখ্যককে রোমান সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করেন। কিন্তু রোমান সেনাধ্যক্ষগণ ভিসিগথদের উপর অবিচার শুরু করেন। তাদের ঠিকমত মাহিনা দেয়া হত না। সর্বোপরি ভিসিগথরা চেয়েছিল একটি স্থায়ী বাসস্থান, সামরিক বাহিনীর চাকুরী তাদের কাম্য ছিল না। এসব কারণেই তারা পুনরায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এবার তাদের নেতৃত্বে দানে এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত নেতা অ্যালারিক। তারই অধীনে ভিসিগথরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পুরো গ্রীস ভূখণ্ড তছনছ করে দেয় এবং রোমের দিকে অগ্রসর হয়। ৪১০ খৃষ্টাব্দে অ্যালারিকের বাহিনী রোম শহর আক্রমণ করে এবং পুরো ছ'দিন ধরে লুন্ঠন করে শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এর পর তারা সিসিলির দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পূর্বেই অ্যালরিকের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর ভিসিগথরা বাইজেন্টাইন সম্রাটের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং গ্যারোন নদী ও পিরেনীজ পর্বতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বাসভূমি রূপে লাভ করে। তারপর তারা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে স্পেন পর্যন্ত অধিকার করে এবং সেখান থেকে ভ্যাণ্ডালদের তাড়িয়ে ৪১৯ খৃষ্টাব্দে ভিসিগথদের রাজ্য স্থাপন করে।

ভিসিগথদের সাথে সাথেই শুরু হয় হুনদের অভিযান। তারা শুধু গথদের দমন করেই ক্ষান্ত হয় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হুনরা দুর্ধর্ষ এ্যাটিলার নেতৃত্বে নিষ্টার নদী অতিক্রম করে পশ্চিমদিকে প্রবল আক্রমণ চালায়। সমগ্র বল্কান উপদ্বীপ অধিকার করে হুনবাহিনী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের উপর অভিযান পরিচালনা করে এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ আদায় করে ও তাঁকে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করে। আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে অ্যাটিলার বাহিনী সম্মিলিত রোমান ও ভিসিগথ বাহিনীর হাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ৪৫১ খৃষ্টাব্দে কেলনস (chalons)-এর যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করে। পর বছর কেলনস এর যুদ্ধে হুনবাহিনীর সমস্ত শক্তি

www.pathagar.com

বিধ্বস্ত হয়। যদিও এ্যাটিলা ও তার সৈন্যবাহিনী রোমের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিল, তথাপি রোম শহর আক্রমণ করতে তারা সাহসী হয়নি। ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে এ্যাটিলার মৃত্যু হয় এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে হুন সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে।

মধ্য ইউরোপে হুনদের অভিযান অন্যান্য জার্মান জাতিকেও নতুনভূমির সন্ধানে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে। ভ্যাণ্ডালগণ প্রথমে গলদেশে ও পরে স্পেনে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু ভিসিগথরা স্পেনে প্রবেশ করলে ভ্যাণ্ডালরা ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডাল রাজ্য স্থাপন করে। ভ্যাণ্ডাল রাজা জেনসেরিক বিশাল নৌবহর তৈরী করে তার সাহায্যে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে রোম আক্রমণ করেন। পুরো দু' সপ্তাহ ধরে রোমের সমস্ত সম্পদ লুট করা হল। রোম আরেকবার বর্বরদের আক্রমণের শিকার হল।

বারগেণ্ডীয়রা রোন নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তার করে।

পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, জুট ও থুরিঞ্জীয়রা ব্রিটেন আক্রমণ করে এবং সেখানকার কেল্টিক অধিবাসীদের পরাজিত করে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। অ্যাঙ্গলদের নাম অনুসারে পরবর্তীকালে এদেশের নাম হয় ইংল্যাণ্ড।

ফ্রাঙ্করা প্রথমে রাইন নদীর মোহনার নিকট বাস করত। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা গলদেশের উত্তরাঞ্চল অধিকার করে নেয় এবং লয়ের নদী পর্যন্ত তাদের রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করে।

গথদের আরেক শাখা অষ্ট্রগথরা তাদের নেতা থিওডরিকের নেতৃত্বে ইতালীতে রাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু পরে বাইজেন্টাইন বাহিনীর দ্বারা পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জার্মানজাতির সর্বশেষ অভিযানকারী ছিল লম্বার্ডগণ। তারা ইতালীর উত্তরাঞ্চল অধিকার করে এবং পো নদী পর্যন্ত অঞ্চল দখল করে নেয়।

মোটামুটিভাবে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জার্মান বর্বর জাতিদের দখলে আসে।

এই শতাব্দীতেই আভ্যন্তরীণ সঙ্কটে নিমজ্জিত জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু রোমান সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। যে দাসপ্রথার উপর ভিত্তি করে রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেটা তার নিজস্ব অসংগতির

www.pathagar.com

দরুনই ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দাসশ্রম উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রোমান সাম্রাজ্যের শেষপর্বে কৃষিবিজ্ঞান এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যখন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ কারিগরি জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছিল। এই কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ শুধুমাত্র সচেতন শ্রমের দ্বারাই সম্ভব ছিল। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিতে অনাগ্রহী দাসশ্রমের সাহায্যে কৃষিতে কোন রকম কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের বিন্দুমাত্র উপায় ছিল না। অতএব উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের প্রয়োজনেই উৎপাদন প্রথার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ক্রমাগত দাসবিদ্রোহ, কলোনী ও কারিগরদের বিক্ষোভ দাসভিত্তিক রোমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমাবনতি ঘটাচ্ছিল। কখনও কখনও এ সকল বিদ্রোহ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করছিল যে পুরো শক্তি প্রয়োগ করেও রোমের রাজশক্তি এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় বহিঃশত্রু বর্বরদের আক্রমণে জরাজীর্ণ রোমান সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে।

৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান নেতা অডোএকার সর্বশেষ রোমান সম্রাট রোমিউলাস অগাষ্টাসকে রোমের সিংহাসন থেকে অপসারণ করে নিজে সিংহাসন দখল করেন। এ তারিখকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সর্বশেষ তারিখ রূপে গণ্য করা হয়। সেই সঙ্গে অবসান ঘটে প্রাচীন যুগের।

রোমান সাম্রাজ্যকে অবলম্বন করেই যেহেতু অবক্ষয়িত দাসপ্রথা শেষপর্যন্ত টিকে ছিল, তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে রোম সাম্রাজ্যের অবসানকে দাসযুগের অবসানই বলা যায়।

জার্মান অভিযানের প্রাথমিক ফলাফল

জার্মান বর্বরদের আক্রমণ প্রাথমিক পর্যায়ে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে। তারা ঘরবাড়ী, শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম, সুউচ্চ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর ইমারত সবকিছুই ভেঙ্গে চুরে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তাদের আক্রমণের ফলে কৃষিকাজ, ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। চাষবাসের কাজ যদিও কিছুদিন পরে আবার শুরু হয় কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতির ফলে এবং

www.pathagar.com

বন্দরগুলো একেবারে অকেজো হওয়ার দরুন বহু শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য পুনরায় চালু হয়নি।

জার্মানগণ কেবলমাত্র গ্রামীন অর্থনীতির সাথেই পরিচিত ছিল। কাজেই রোমানদের অনুরূপ নগরভিত্তিক সভ্যতা তারা গড়ে তুলতে পারেনি। রোমানদের উচ্চতর সাংস্কৃতিক মানকে অনুধাবন করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। জার্মানগণ রোমানদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জমি অধিকার করে নেয়। তা সত্ত্বেও রোমানদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে তারা সক্ষম হয়নি। উভয়ে একত্রে অবস্থান করার দরুন রোমান ও জার্মান—এ দু জাতির সংমিশ্রণে দীর্ঘকাল ধরে একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বিশেষতঃ সংখ্যায় জার্মানগণ স্বল্প হওয়ার ফলে এবং সাংস্কৃতিক মান রোমানদের তুলনায় নিকৃষ্ট হওয়ার দরুন কোথাও কোথাও জার্মানগণ রোমান সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ভাষা কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। কোন কোন জার্মান রাজা সম্পূর্ণরূপে রোমানদের শাসন পদ্ধতি অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করে। যদিও রাজনৈতিকভাবে তারা ছিল রোমানদের শত্রু তথাপি রোমানদের সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে তারা এমনভাবে গ্রহণ করেছিল যে পরবর্তীকালে সেটা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে জার্মানদের সকল কার্যকলাপই পশ্চিম ইউরোপের জনগণের কাছে ক্ষতিকর ছিল। রোমান সম্রাটদের সীমাহীন বিলাসিতা, প্রজাদের উপর বিপুল করভার, দুর্নীতি পরায়ণ রাজকর্মচারী ও সামরিক অফিসারদের অত্যাচার এবং সর্বোপরি স্থানীয় ভূস্বামীদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ, সবকিছুই জনগণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। কাজেই অনেকক্ষেত্রে জার্মানদের আক্রমণকে তারা বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপই মনে করেছে। ক্রীতদাস ও কলোনীরা জার্মানদের পক্ষ নিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, জার্মান সৈন্যবাহিনীতে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং জার্মান-বাহিনীকে নগর তোরণ উন্মুক্ত করে স্বাগত জানিয়েছে। জার্মানদের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ধনী রোমান ভূস্বামী ও দাস মালিকরা। এদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে ধনসম্পত্তি অধিকার করে জার্মানরা লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দিয়েছিল। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপের মাটিতে রাজ্য স্থাপন কালে জার্মানরা স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

নতুন ভূমিতে জার্মানগণ তাঁদের আচার ব্যবহার ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করল। অবশ্য দীর্ঘকাল রোমানদের পাশাপাশি বাস করার ফলে রোমানদের সভ্যতার প্রভাবও তাদের উপর পড়েছিল প্রচুর পরিমাণে। বিশেষ করে উন্নততর চাষাবাদ পদ্ধতি ও কৃষিকার্যে উৎকৃষ্ট হাতিয়ারের ব্যবহার তারা রোমানদের কাছ থেকেই শিখেছিল। তবে উৎপাদনে স্বাধীন কৃষকদের নিযুক্তির ফলে তারা রোমান ক্রীতদাসদের চেয়ে বেশী পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। উৎপাদনে স্বেচ্ছাশ্রমের প্রয়োগ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্কট দূর করতে সক্ষম হল।

জার্মানগণ নিজ দেশের প্রথার অনুকরণে পশ্চিম ইউরোপেও প্রথমে ক্ল্যানভিত্তিক চাষাবাদ প্রথা চালু করে। উৎপাদিত ফসল সকলের ভোগেই লাগত। পরবর্তীকালে অবশ্য পরিবার ভিত্তিক চাষের জমি বিতরণ করা হয় এবং বংশ পরম্পরায় তারা এগুলো ভোগ করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এ জমি বিক্রি করা, অন্য কারও সাথে বদল করা বা কাউকে দান করার অধিকার তাদের ছিল না।

সামরিক অভিযানের ফলে একই গোষ্ঠীর লোকেরা অধিকাংশ সময়েই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নূতন জায়গায় তারা অন্য গোষ্ঠীর সাথে একত্রে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এভাবে অনেক গ্রামেই বহু গোষ্ঠীর লোক একসঙ্গে বসবাস করতে থাকে। এসব গ্রামের লোকদের বলা হত সদ্য 'প্রতিবেশী সমাজ'। স্বাধীন ক্রীতদাস ও রোমান কলোনিরাও এদের সঙ্গে একত্রে বাস করতে শুরু করে। এর ফলে জার্মানদের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের মূলভিত্তি ক্রমেই ধ্বসে পড়তে থাকে। সামরিক অভিযান জার্মানদের মধ্যকার শ্রেণী বিভেদকেও তীব্রতর করে তোলে। অবশ্য আগের থেকেই জার্মানদের মধ্যে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। গোষ্ঠীপতি, সামরিক নেতা প্রভৃতিরা সমাজের অন্যান্যদের চেয়ে অধিক সুযোগ সুবিধা ও ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণের পর তাদের শ্রেণী বৈষম্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়। দলপতি, সেনাধ্যক্ষ ও অন্যান্য নেতারা রোমান দাসমালিক ও ভূস্বামীদের জমিজমা, ক্রীতদাস, কলোনি ও অন্যান্য সম্পত্তি দখল করে নেয়। ফলে দলের অন্যান্যদের চেয়ে তারা বহুগুণ বেশী সম্পত্তির মালিক হয়। অবশ্য তারা রোমান ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেয় এবং তাদের প্রত্যেককে এক একটি ছোট ভূমিখণ্ড চাষাবাদের জন্য

www.pathagar.com

দিয়ে দেয়। এরা স্বাধীনভাবে সেগুলো আবাদ করার অনুমতি পায় এবং বিনিময়ে জার্মান ভূস্বামীকে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে জার্মান সমাজ ক্রমশঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ শ্রেণী-বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে জার্মান অভিজাত সম্প্রদায় রোমানদের অনুরূপ একটি রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন অনুভব করে। জার্মানদের নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এক্ষেত্রে অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়। বিজয়ী জার্মান নেতৃবর্গ ও সামরিক নেতৃবৃন্দ বিজিত দেশের জনগণকে অধীনস্থ রাখার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী, প্রশাসনযন্ত্র, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা, কর আদায় ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলে। এ ভাবে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার। এ নতুন রাষ্ট্রের কাজ হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংহতি বজায় রাখা। অবশ্য এ নতুন সমাজ দাস ও দাসমালিকের পরিবর্তে সামন্ত-প্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যকার বৈষম্যের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল।

জার্মানদের রাজ্য স্থাপন

গথ জাতির ইতিহাস

পঞ্চম শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানদের ইতিহাসকে 'অন্ধকারের যুগ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জামান জাতিসমূহ পশ্চিম ইউরোপে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়। কিন্তু গথ ও ফ্রাঙ্কগণ ব্যতীত আর প্রায় সকলেই অল্পদিনের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার একটি প্রধান কারণ ছিল যে তারা সংখ্যায় রোমান-দের তুলনায় কম ছিল। উপরন্তু রোমানদের উচচতর সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে তারা ক্রমশঃই তাদের নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে।

একমাত্র গথরা কিছুকাল এবং ফ্রাঙ্কগণ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভিসিগথরা ভ্যাণ্ডালদের স্পেন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্বর জাতির ইতিহাসে ভিসিগথরাই সর্বপ্রথম একটি রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ভিসিগথদের রাজা প্রথম থিওডোরিক

www.pathagar.com

৪৩৬ খৃষ্টাব্দে রোমানদের নিকট থেকে দক্ষিণ গলের কয়েকটি শহর দখল করতে সক্ষম হন। ৪৩৯ খৃষ্টাব্দে রোমান জেনারেল ইটিয়াসকে তুলোর নিকটে পরাজিত করে তিনি তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় থিওডোরিক লয়ের নদীর তীর পর্যন্ত ভিসিগথদের রাজ্য সীমা বর্ধিত করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা ইউরিক কর্তৃক নিহত হন। ইউরিককে ভিসিগথদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। তিনি স্পেন থেকে রোমান শাসনের সর্বশেষ চিহ্নটুকু অবলুপ্ত করেন। তিনি এন্টিকা (Antiqua) নামক জার্মান আইনের সর্বপ্রথম সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই ভিসিগথ রাজ্যে দুর্যোগের সূচনা হয়। ভিসিগথ ও রোমান অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া ভিসিগথ বা জার্মানদের মধ্যে রাজতন্ত্র প্রচলিত না থাকায় সিংহাসনের দখল নিয়েও প্রচণ্ড লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। এ অবস্থার সুযোগে মুসলিমগণ তাদের সুযোগ্য সেনাপতি তারিকের নেতৃত্বে ৭১১ খৃষ্টাব্দে স্পেন আক্রমণ করে। জেরেজ (Xerez) -এর যুদ্ধে ভিসিগথদের সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করে মুসলিমগণ স্পেনে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠিত করে। শুধুমাত্র পীরেনিজ পর্বতের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা ৭১৫ খৃষ্টাব্দে কর্ডোভায় তাদের রাজধানী স্থাপন করে।

ভিসিগথদের পরে পশ্চিম ইউরোপে যারা রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয় তারা হল অস্ট্রোগথ জাতি। এদের অভিযানের কথা আগেই বলা হয়েছে। হুনদের আক্রমণে এরা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কেলোন্স-এর যুদ্ধে এটিলার পরাজয় সমগ্র হুন সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনে। অন্যান্য-দের সাথে অস্ট্রোগথরাও প্রায় সাতাত্তর বছর যাবৎ হুনদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। এমনকি কেলোনস-এর যুদ্ধে এ্যাটিলার বাহিনীর পক্ষ নিয়ে তারা অন্যান্য জার্মান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। হুন সাম্রাজ্যের পতনের পর অস্ট্রোগথগণ বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করে বটে কিন্তু তারা তখন দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত। দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে রোমান ও হুন সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে তারা জীবনযাপন করছিল। সমগ্র এলাকা তখন দুর্বৃত্ত ও সমাজ বিরোধীদের আস্তানা এবং প্রায়ই তারা পূর্বে রোমান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হত। শেষ পর্যন্ত এই সামরিক বাহিনীতেই তারা চাকুরী

www.pathagar.com

গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু তাতেও অস্ট্রোগথদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হল না। পুনরায় তারা অত্যধিক পরিশ্রম, অল্প খাদ্য, অনিয়মিত বেতন—কর্মকর্তাদের এ ধরনের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হল।

এর ফলে আবার তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং অচিরেই সে বিদ্রোহ নির্মম ভাবে দমন করা হল। ভবিষ্যতে তাতে তারা আর বিদ্রোহ করার চেষ্টা করতে যাতে না পারে সেজন্য বাইজেন্টাইন বাহিনী অষ্ট্রোগথদের নেতা থিওডোরিককে তাদের নিকট জামিন স্বরূপ কনষ্টান্টিনোপলে আটক রাখে। কনষ্টান্টিনোপলের রাজপ্রাসাদের প্রচণ্ড বিলাসিতায় থিওডোরিককে নিমগ্ন রাখা হল এবং সর্বোচ্চ পদে তাকে অধিষ্ঠিত করা হল। প্রথমে তাকে সিনেটের সদস্য, পরে রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং সবশেষে কন্সালের পদে নিয়োগ করা হল। এ সবই করা হল একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—থিওডোরিক যেন তার জাতিকে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু বাইজেন্টাইন সম্রাটের এত প্রচেষ্টা সবটুকুই ব্যর্থ হল। এত আরাম, আয়েশ ও বিলাসিতার বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও থিওডোরিক কিছুতেই ভুলতে পারেননি যে তাঁর দলবল অনাহারে, দুর্ভিক্ষে, মহামারিতে বিপর্যস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি কনষ্টান্টিনোপলের রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁর দলের সাথে মিলিত হলেন (৪৭৪ খৃঃ)।

কয়েক বছর ধরে থিওডোরিক ও তাঁর দলবল বলকান উপদ্বীপের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তাদের অভিযান চালিয়ে যায়। বাইজেন্টাইন বাহিনী তাদের বিপুল শক্তি সত্ত্বেও এদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে বাইজেন্টাইন সম্রাট জেনো থিওডোরিকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইতালী দেশটি অষ্ট্রোগথদের প্রদান করতে স্বীকৃত হলেন। এর আগেই ইতালী অডোএকার অবশ্য দখল করে নিয়েছিল। সম্ভবতঃ সেটা পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা ছিল না বলেই সম্রাট সেটা থিওডোরিককে প্রদান করেন।

৪৮৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে থিওডোরিকের নেতৃত্বে অষ্ট্রোগথ বাহিনী তাদের অগ্রাভিযান শুরু করে এবং পর বৎসর তারা এডিজ নদী অতিক্রম করে ইতালীতে উপস্থিত হয়। পর পর তিনটি যুদ্ধে তারা অডোএকারকে পরাজিত করে তাকে র‍্যাভেনায় বিতাড়িত করে এবং সমগ্র ইতালী উপদ্বীপে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। কিছুদিন পরে অডোএকার আততায়ীর হাতে নিহত হন। আইনতঃ থিওডোরিক বাইজেন্টাইন সম্রাটের প্রতিনিধি

www.pathagar.com

হলেও কার্যতঃ তিনি ছিলেন সমগ্র অষ্ট্রোগথ সাম্রাজ্যের স্বাধীন ও সার্বভৌম সম্রাট। ইতালী, সিসিলি, প্যানোনিয়া, ইলিরিয়া, ডালমাসিয়া এবং প্রভেন্স সহ বিরাট এলাকা জুড়ে এ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

থিওডোরিক প্রায় তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং জার্মান শাসকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই রোমকে মোটামুটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর শাসনকালে ইতালীর হৃত গৌরব অনেকখানি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র রাজ্যে তিনি কেবল সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রাস্তাঘাটই নির্মাণ করেননি, ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ও জনগণের মঙ্গলার্থে বহুবিধ কাজ তিনি করে গেছেন। সর্বোপরি দেশে তিনি একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন যা তার পূর্ববর্তী রোমান শাসকগণও দিতে পারেননি। তথাপি অষ্ট্রোগথদের রাজ্য ইতালীতে বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ রোমান জনগণ ও আমলাতন্ত্র (যাদের অধিকাংশকেই বহাল রাখা হয়েছিল) সর্বদা অষ্ট্রোগথদের বিরোধিতা করেছে। রোমান ভূস্বামীদের সম্পত্তিতে তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি। কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক ভূস্বামীবৃন্দ সর্বদাই থিওডোরিকের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

সর্বোপরি থিওডোরিক খৃষ্টধর্মের এরিয়ান মতবাদ গ্রহণ করার ফলে চার্চ ও পোপের সহযোগিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়েছিলেন। মধ্য যুগে ধর্ম গুরুর সমর্থন ব্যতীত কারও পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। ফলতঃ থিওডোরিকের মৃত্যুর পর ৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের সৈন্যবাহিনী ইতালী আক্রমণ করলে তথাকার রোমান জনগণ তাদের স্বাগত জানায় এবং অষ্ট্রোগথ সৈন্যবাহিনীর সর্বাত্মক প্রতিরোধ সত্ত্বেও ইতালী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের করায়ত্ত হয়।

ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস

সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যে একমাত্র ফ্রাঙ্কগণই ইউরোপের পরবর্তী ইতিহাসে নিজেদের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ফ্রাঙ্করা প্রথমে রাইন নদীর তীরে বাস করত। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে এরা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—স্যালিয়ান ফ্রাঙ্ক ও রাইপুরিয়ান ফ্রাঙ্ক। সর্বশ্রেষ্ঠ স্যালিয়ান রাজা ছিলেন ক্লভিস। তিনি রাইপুরিয়ান রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে সমগ্র ফ্রাঙ্ক

www.pathagar.com

জাতিকে একই জাতিতে পরিণত করেন এবং তাদের নিজের অধীনে আনয়ন করেন। ক্লভিসের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম ছিল মেরোভিঞ্জিয়ান।

৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্লভিস প্রথমে রোমান শাসক সায়াগ্রিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। লয়ের নদীর উত্তরাংশে তখনও পর্যন্ত রোমান শাসন বলবৎ ছিল। পরপর দুটি সামরিক অভিযানের মারফৎ সায়াগ্রিয়াসের অধীনস্থ অঞ্চলগুলি ক্লভিস দখল করে নেন। ক্লভিসের রাজ্যের দক্ষিণে আরও দুটি জার্মান রাজ্য ছিল। প্রথমটি ছিল বার্গাণ্ডিয়ানদের। বার্গাণ্ডিয়ান রাজা গাণ্ডোবাল্ড ক্লভিসের হাতে নিহত হন এবং ক্লভিস তার ভ্রাতুষ্পুত্রী ক্লটিণ্ডারকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্বে তিনি তাঁর অনুচরবর্গ সহ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

লয়ের নদীর দক্ষিণের অঞ্চল তখনও পর্যন্ত ভিসিগথদের হাতে ছিল। ক্লভিসের হাতে তারা পরাজিত হয় এবং স্পেনে পলায়ন করে। শুধুমাত্র দক্ষিণ পূর্বের একটি অংশ অষ্ট্রোগথ রাজা থিওডরিককে ক্লভিস ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

এভাবে ক্লভিস তাঁর রাজ্য রাইন নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত করেন। এবং সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যে একমাত্র ফ্রাঙ্কদের রাজ্যই নবম শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল।

যেখানে অন্যান্য জার্মানগণ অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রোমান-দের মধ্যে মিশিয়ে দিল সেখানে কি ভাবে ফ্রাঙ্ক জাতি এতকাল পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

অতি অল্প সংখ্যক ফ্রাঙ্ক সৈন্য নিয়ে ক্লভিস তাঁর সামরিক অভিযান শুরু করেন। এরা খুব সহজেই উন্নত রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারত যা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কিন্তু তা হয়নি প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে। প্রথমতঃ ফ্রাঙ্কদের সামরিক অভিযান শুধুমাত্র দেশত্যাগ ছিল না। তারা নূতন দেশ দখল করে সেখানে বসবাস শুরু করলেও তাদের মাতৃভূমির সাথে কখনই সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। সর্বদা নিজভূমির সাথে যোগাযোগ থাকার ফলেই তারা কখনই রোমানদের দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। দ্বিতীয়তঃ রোমান রাজ্য দখলের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্করা অন্যান্য জার্মানদের রাজ্যও

www.pathagar.com

দখল করেছে। ফলে একদিকে তারা যেমন রোমানদের সংস্পর্শে এসেছিল, অন্যদিকে বর্বরদের সান্নিধ্যও তারা লাভ করেছিল। ফলে রোমানদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে তারা মুক্ত ছিল।

তৃতীয় এবং সর্বপ্রধান কারণ হল যে ক্লভিস ও সমগ্র ফ্রাঙ্ক জাতি গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। খৃষ্টধর্মের গোঁড়া মতবাদ (আথানাসিয়াসের মতবাদ) পোপ কতৃক স্বীকৃত একমাত্র ধর্ম হিসাবে পরিচিত ছিল। ফলে ক্লভিস ও ফ্রাঙ্কজাতি পোপ ও তাঁর সহযোগীদের আশীর্বাদ লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। অষ্ট্রোগথ রাজা থিওডরিক এ ধর্ম গ্রহণ না করায় পোপের রোষানলে পতিত হন। অন্যদিকে সমগ্র জার্মান জাতির নেতাদের মধ্যে ক্লভিসই একমাত্র ভাগ্যবান পুরুষ যিনি শুধুমাত্র পোপের সমর্থন ও সহযোগিতাই লাভ করেননি, উপরন্তু সমগ্র খৃষ্ট জগতের আশীর্বাদ তাঁর উপর বর্ষিত হয়। ফ্রাঙ্কদের টিকে থাকার মূল কারণ ছিল এটাই। ক্লভিস তাঁর বিজিত রাজ্যের ভূখণ্ড বিশ্বস্ত অনুচর ও সেনাপতিদের মধ্যে বিতরণ করেন। ফলে তারা এক একজন বৃহৎ ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হয়। যে সকল রোমান ভূস্বামী ক্লভিসের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়, তারা নিজ নিজ জমি দখলে রাখার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এরা ফ্রাঙ্কদের সাথে সহযোগিতা করে এবং গলে ফ্রাঙ্কদের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

ফ্রাঙ্ক ভূস্বামীগণকে জমি বিতরণ করলেও ক্লভিস অধিকাংশ ভূখণ্ড নিজের হাতেই রেখে দেন। দিনে দিনে ক্লভিসের অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধিকাংশ ফ্রাঙ্ক ভূস্বামী রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তা ছাড়া যেসব সামরিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে মারা যান তাদের অধীনস্থ সৈন্যরা ক্লভিসের অধীনতা স্বীকার করে। এদের সাহায্যে ক্লভিস তাঁর রাজ্য সংহত ও সুদৃঢ় করেন।

রাজশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্লভিস ফ্রাঙ্কদের প্রচলিত শাসননীতির পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি গণপরিষদের সভা আহ্বান ক্রমশ পরিত্যাগ করেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে ক্লভিস শুধুমাত্র বিশ্বস্ত ভূস্বামীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। অন্যদের শুধুমাত্র রাজার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হত।

এতদিন পর্যন্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও অপরাধের শাস্তি-বিধানের দায়িত্ব শুধুমাত্র গণপরিষদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এখন থেকে

www.pathagar.com

রাজাই প্রধান বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। সাধারণ জনগণের যেহেতু রাজার নিকট পৌঁছবার ক্ষমতা ছিল না, সেহেতু স্থানীয় জমিদার ও ভূস্বামীরা ছিল তাদের বিচারকর্তা।

বৃহৎ ভূস্বামীগণ তাদের জমি, গবাদিপশু ও অন্যান্য ধনসম্পদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাজার নিকট দাবী জানায়। ক্লভিস ফ্রাঙ্কদের পুরান আইন-কানুন ও রাজার জারীকৃত নতুন আইন ও আদেশ-নামা সংকলন করার নির্দেশ দেন। এভাবে প্রথম ফ্রাঙ্করা তাদের নতুন সংকলিত আইন লাভ করে।

এ আইন দ্বারা কোন সম্পত্তি চুরি করলে বা বাসগৃহ, শস্যক্ষেত্র, শস্যের গোলা প্রভৃতিতে অগ্নি সংযোগ করলে বা কোন স্বাধীন ফ্রাঙ্ক নাগরিক বা রাজকর্মচারীকে হত্যা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দানের নির্দেশ দেয়া হয়।

কিন্তু লিখিত নির্দেশই যথেষ্ট নয়। ফ্রাঙ্ক ভূস্বামীগণ তাদের ধন-সম্পত্তির স্থায়িত্ব রক্ষাকল্পে এমন একটি ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যা জনগণকে অবদমিত রাখতে সহায়তা করবে। ফ্রাঙ্কদের নিজস্ব ধর্ম এ ব্যাপারে সাহায্য না করায় তারা খৃষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। খৃষ্ট-ধর্মে দারিদ্র্যের জয়গান গাওয়া হয়েছে, জাগতিক সর্ব বিষয়ের প্রতি, ধন-সম্পত্তির প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা হয়েছে, সর্বোপরি সব বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের বিধান হিসাবে মেনে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হতে পারে? ক্লভিস ও তাঁর অনুগামীদলসহ সমগ্র ফ্রাঙ্কজাতির খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পশ্চাতে এটাই ছিল একমাত্র কারণ।

খৃষ্টধর্মের আবির্ভাব

অগাষ্টাস সীজার যখন সাম্রাজ্যবাদী একনায়কতন্ত্রী রোমের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, ঠিক এখনই তার সাম্রাজ্যে এক যুগান্তকারী মহানায়কের আবির্ভাব ঘটে। রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জেরুজালেম প্রদেশের বেথলেহেম নামক গ্রামের এক আস্তাবলে এই মহাপুরুষের জন্ম হয় খৃষ্টীয় প্রথম অব্দে। এই মহানায়ক যীশুখৃষ্ট, রোমের মানবতাবিরোধী দাসতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ হিসাবে তার প্রচারিত খৃষ্টধর্ম সারা রোমান সাম্রাজ্যে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। গ্রেকো-রোমান যুগের মুদ্রাভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতির উপযুক্ত ভাবাদর্শ সৃষ্টির যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, দাসতন্ত্রের উপস্থিতির ফলে তা কখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সমাজের তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে, তাদের পশুর মত জীবনযাপনে বাধ্য করে দাসপ্রথা যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল—রোমান সাম্রাজ্য সে সঙ্কট থেকে আর পরিত্রাণ পায়নি।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি যে বিশ্বজনীন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছিল সে চাহিদা মেটাতেই আবির্ভূত হয়েছিল খৃষ্টধর্ম।

যীশুখৃষ্টের জীবনকাহিনী ও খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের বিবরণের মূলসূত্র বাইবেলের নতুন টেষ্টামেন্ট। যীশুর প্রধান সহচরদের লিখিত বিবরণ থেকেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

যীশুর জন্মস্থান জেরুজালেম ছিল প্রধানতঃ ইহুদীদের বাসভূমি। বাল্যকাল থেকেই যীশু ইহুদী ধর্মযাজকদের সাথে ধর্মবিষয়ে নানারূপ তর্কে প্রবৃত্ত হতেন। কতক বিষয়ে তাদের সাথে যীশুর মতপার্থক্য দেখা দেয়—এবং সেই সাথে যীশুর নিজস্ব মতে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক তাকে ধর্ম প্রচারক বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলে মেনে নেয়। এর ফলে ইহুদীরা তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে।

দিন দিন তাঁর অনুগতের সংখ্যা বেড়ে চলল এবং যীশুর মানবতার বাণী দলে দলে লোককে—বিশেষ করে ক্রীতদাস, নিঃস্ব মজুর, কৃষক ও দরিদ্রদের তাঁর ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের মানবতা এবং বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দাসতান্ত্রিক রোমান সাম্রাজ্যে কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। রোমান শাসকগণ স্বয়ং যীশুকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মনে করলেন। তাঁদের ধারণায় যীশু একটি পাল্টা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এই অভিযোগে যীশুকে অভিযুক্ত করা হয় এবং জেরুজালেমের রোমান শাসক পন্টিয়াস পাইলেট তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। যীশুকে অতঃপর ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

খৃষ্টধর্মের জন্ম মরুবাদী আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে। যীশুখৃষ্ট পৃথিবীতে এক স্বর্গরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন,

www.pathagar.com

পৃথিবীর প্রতিটি নরনারী আদি পিতা ও মাতা আদম ও ঈভের পাপের অংশ বহন করে জন্মেছে। এই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবন যাপন। মিথ্যাচরণ, হঠকারিতা ও প্রবঞ্চণার তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। ধনদৌলত, পার্থিব সুখ-সম্পদ ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। যীশু ধন-বৈষম্য লোপ করার উপদেশ দিয়েছেন; কেননা সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক স্বয়ং ঈশ্বর। সমাজ-সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক আন্দোলন। কিন্তু খৃষ্টধর্মের আন্দোলন যদি শুধু এই নীতিবাক্য ও আদর্শবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত।

একে এক বিশ্বধর্মরূপে প্রচার করে সেন্টপল খৃষ্টধর্মকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান, উপাসনা, যাদুবিদ্যা, প্রভৃতির পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হল; সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য এক জীবনাদর্শ ও দর্শন তৈরী করা হল। এ কাজ সম্পাদনের জন্য খৃষ্টধর্ম মিথ্রাইজম, সেরাপিস-আইসিস ধর্ম, ষ্টোইক-দর্শন ও বিশেষ করে নিও-প্লাটো-নিজম থেকে মতবাদ গ্রহণ করল। খৃষ্টধর্মের মূল উপদেশের সাথে যথাসম্ভব সঙ্গতি রেখে প্রয়োজন মত বেছে বেছে এসব অনুষ্ঠান কৌশলে গ্রথিত করা হয়েছে।

ওরিগেন (১৮৫—২৫৪ খৃঃ) গ্রীক দর্শন থেকে নানা মত ও তথ্যের সমাবেশ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস সুপ্রাচীন দর্শন ও জ্ঞান থেকে উদ্ভূত। লোগোস বা বিশ্বাত্মার নিত্যতা, আত্মার পূর্বাপর অস্তিত্ব প্রভৃতি গ্রীক অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে তিনি প্রচার করলেন যে, ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল। খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা করে দেয়। সেন্ট অগাষ্টিন (৩৫৪—৪৩০ খৃঃ) এই দার্শনিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় রূপে রচনা করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে, বিশেষতঃ প্লেটোনিক দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি সমগ্র জ্ঞানের এক সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর চেষ্টায় খৃষ্টধর্ম এক অধ্যাত্ম দর্শনে পরিণত হয়। সেন্ট অগাষ্টিন মরমীবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন; ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি মরমীবাদ ও যাদুবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। সেন্ট জেরোম, সেন্ট গ্রেগরী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ধর্ম-

www.pathagar.com

যাজকগণ অত্যাশ্চর্য ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য যাদুবিদ্যারও আশ্রয় নেন।

যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর তার প্রধান চারজন সহচর—সেন্টপিটার, সেন্ট পল, সেন্ট মথি ও সেন্ট লিউক খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তাঁদেরই চেষ্টায় খৃষ্টধর্মের ব্যাপক ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ব্যাপী যে প্রচণ্ড অবক্ষয় ও দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সাধারণভাবে মানুষের মনে এক অনিশ্চয়তা ও হতাশার জন্ম দিয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যীশুখৃষ্টের মরমীবাণী মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেয় এবং তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। খৃষ্টধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানুষের প্রতি বিশ্বপিতার ভালবাসা, তাদের দুর্গতি মোচনের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর সন্তানকে প্রেরণ এবং এ জীবনের দুঃখ ও কষ্টের সমাপ্তিতে পরকালে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দলাভের আশ্বাস ইত্যাদি সে যুগের নির্যাতিত, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষকে সকল দুঃখ বেদনা সহ্য করার অপরিসীম প্রেরণা যোগায়। দিন দিন খৃষ্টধর্মের অনুরক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খৃষ্টধর্মের এই ব্যাপক প্রচার রোমান সম্রাটদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং খৃষ্টানদের উপর নেমে আসে ব্যাপক নির্যাতন ও অত্যাচার। যখনই কোন দুর্ভিক্ষ, মহাপ্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিত তখনই খৃষ্টানদের এর জন্য দায়ী করা হত। খৃষ্টানদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে পড়ে যখন ইহুদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে (৭০ খৃঃ) এবং জেরুজালেম নগরী ধ্বংস করে। নিরো, ডমিসিয়ান, মার্কাস অরেলিয়াস প্রভৃতি রোমান সম্রাটগণ ব্যক্তিগতভাবে খৃষ্টান বিদ্বেষী ছিলেন বলে তাঁদের সময়ে খৃষ্টানগণ সর্বাধিক নির্যাতন ভোগ করে। কিন্তু নির্যাতন যতই বৃদ্ধি পায় নব দীক্ষিত খৃষ্টানদের সংখ্যা ততই বেড়ে যেতে থাকে। যেভাবে খৃষ্টানগণ সকল নির্যাতন সহ্য করেছেন তা সকলের—এমনকি খৃষ্ট-ধর্মের শত্রুদেরও মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এই কারণই দিন দিন এ ধর্মের অনুরাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত রোমান সম্রাটগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে খৃষ্টধর্মকে আর কোন কিছুর দ্বারাই দমন করা সম্ভব হবে না। ৩১১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রোমান সম্রাট গ্যালেরিয়াস খৃষ্টানদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার আদেশ দেন।

www.pathagar.com

দু'বছর পরে সম্রাট কনষ্টানটাইন মিলানের নির্দেশের (৩১৩ খৃঃ) মাধ্যমে খৃষ্টানদের ধর্মীয় অধিকার দান করেন। কনষ্টানটাইনই প্রথম রোমান সম্রাট যিনি নিজ সন্তানদের খৃষ্টধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন (যদিও তিনি নিজে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নি)। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস খৃষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র স্বীকৃত ধর্ম বলে ঘোষণা করেন।

মাত্র অল্পাধিক তিনশ বছরের মধ্যে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খৃষ্টধর্ম একটি বিশ্বধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোমানদের ধর্মমন্দিরগুলি ক্রমশঃ ভগ্নদশায় পতিত হয় এবং এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে রোমান ও অন্যান্য ধর্মের প্রচলন বলপূর্বক বন্ধ করা হয়।

পোপতন্ত্রের উৎপত্তি

প্রাথমিকভাবে খৃষ্টধর্ম যেরূপ সরল ও আড়ম্বরহীন ছিল পরে তা আর রইল না। ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা, বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপ এর সাথে যুক্ত হয়ে একে জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলল।

শিশুকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষাদান (Baptism), বিবাহ অনুষ্ঠান ও মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি ছাড়াও প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বহু অনুষ্ঠানের কার্য পরিচালনার জন্য একজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকে একজন ধর্মযাজক গ্রামে গ্রামে লোককে ধর্মোপদেশ দান প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। কিন্তু ক্রমশঃ এইসব ধর্মীয় কাজ গ্রামের চার্চের সার্বক্ষণিক পুরোহিতের উপর অর্পিত হয়। কালক্রমে গ্রামীন চার্চগুলি শহরের একটি চার্চের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। শহরের চার্চের অধিকর্তার নাম প্রেসবাইটার (Presbyter)। তাঁরা আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জেলা বা ডায়োসেস-এর বিশপ-এর নিকট দায়ী থাকতেন। এই বিশপই ছিলেন তাঁর ডায়োসেস-এর সকল গীর্জাভুক্ত সম্পত্তির মালিক; অধীনস্থ ধর্মযাজকদের উপর তার কর্তৃত্ব বহাল থাকত। কয়েকটি ডায়োসেস একটি প্রাদেশিক চার্চের অধীনে ছিল। প্রাদেশিক চার্চের কর্মকর্তাকে বলা হত আর্চবিশপ। প্রদেশগুলি একত্রে আবার একটি প্যাট্রিয়ার্কেট (Patriarchate) গঠন করত। রোমান সাম্রাজ্যে এ রকম পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট ছিল, যথা, রোম, কনষ্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুজালেম ও অ্যান্টিওক। প্যাট্রিয়ার্কেট-এর অধিকর্তা

www.pathagar.com

ছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক. এভাবে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ নীচু থেকে উপর দিকে গড়ে উঠেছিল চার্চ বা গীর্জা সংগঠন।

পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট-এর মধ্য থেকে একটি চার্চকে সর্বোচ্চ সংস্থারূপে নির্বাচিত করা হয় এবং এর অধিকর্তাকে বলা হত পোপ। পোপ-এর কার্য সংস্থার নাম প্যাপাসি (Papacy)।

পোপ ছিলেন খৃষ্টজগতের ধর্মগুরু, সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। রোমান সম্রাটের মত ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরই ক্ষমতা ছিল সর্বশক্তিসম্পন্ন। ধর্মীয় নীতি ব্যাখ্যা ও বিধান দেয়ার একমাত্র কর্তা ছিলেন তিনি।

রোমান সাম্রাজ্যের পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট এক সময়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিল। কালক্রমে রোমের গীর্জাই সবার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এর প্যাট্রিয়ার্ককে পোপ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। (গ্রীক শব্দ 'পোপ'-এর অর্থ পিতা।) রোমের চার্চের প্রাধান্য অর্জনের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল।

প্রথমতঃ রোম ছিল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রস্থল, এবং একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। স্বভাবতঃই রোমের গীর্জার একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। দ্বিতীয়তঃ রোমের চার্চের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যীশুখৃষ্টের প্রধান সহচর সেন্ট পিটার। তিনি ও তাঁর পরবর্তী রোমের বিশপগণ সকল নির্যাতন ও অত্যাচার-এর মুখে খৃষ্টধর্মের পতাকা সমুন্নত রেখেছিলেন। তৃতীয়তঃ রোমের সেন্ট পিটার্স গীর্জার বিশপ খৃষ্ট ধর্মপ্রচার কার্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। দুর্ধর্ষ বর্বরদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে তাদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সকল কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য।

দুর্ধর্ষ হুন নেতা এ্যাটিলাকে রোম আক্রমণ থেকে বিরত রাখার কৃতিত্ব পোপ প্রথম লিও'র প্রাপ্য। পোপ মহান গ্রেগরী লম্বার্ডদের রোমনগরী আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর সময়ে সেন্ট অগাষ্টিন ইংলণ্ডে অ্যাংগল ও স্যাক্সনদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন। পোপ মহান গ্রেগরী রোমের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্রা জারী করা, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত পরিচালনা, প্রাচীর নির্মাণ, স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপনের গুরু দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সাথে পালন করেন। রোমের চার্চ-প্রধানদের মিশনারী কার্যকলাপ তাঁদের মর্যাদাকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

www.pathagar.com

এ ছাড়া কনষ্টান্টিনোপলে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রোমের সিংহাসন প্রায়ই শূন্য থাকত এবং সেক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়েও পোপই নির্দেশ দান করতেন। রোমের চরম সঙ্কট মুহূর্তে এবং বৈদেশিক আক্রমণের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোকে রোমের চার্চই ছিল সকলের আশ্রয়স্থল। এ সকল কারণই তাঁকে খৃষ্টজগতের ধর্ম-গুরুর পদে অধিষ্ঠিত করেছে। ৪৪৫ খৃঃ সম্রাট তৃতীয় ভ্যালেন্টিনিয়ান রোমের গীর্জা প্রধানের বিধান মেনে চলার জন্য সকল খৃষ্টান জনগণকে নির্দেশ দেন। এর পর থেকেই রোমের পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সমগ্র খৃষ্টজগতের নেতৃত্বের ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু পোপের ক্ষমতা শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা কনষ্টান্টিনোপলের চার্চের প্যাট্রিয়ার্ক পোপের আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকৃত হন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং এ দ্বন্দ্ব প্রায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর পরেই রোম ও কনষ্টান্টিনোপলের গীর্জাদ্বয়ের মধ্যে চিরতরে বিভেদের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম ইউরোপের গীর্জাগুলি (যা ক্যাথলিক গীর্জা নামে পরিচিত) রোমের পোপের অধীনতা স্বীকার করে নেয় এবং গ্রীক অর্থোডক্স গীর্জা নামে অভিহিত পূর্ব ইউরোপের গীর্জাগুলি কনষ্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্কের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। গীর্জার সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী হওয়ার পর এর নীতি সংক্রান্ত বিরোধগুলির মীমাংসার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়। দুটি পরস্পর বিরোধী মতের একটির প্রবক্তা আলেকজান্দ্রিয়ার আরিয়াস-এর মতে যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের সমতুল্য নন। এর বিরোধী মতের অধিকারী আথানাসিয়াস বলেন, পুত্র যীশু ও পিতা ঈশ্বর একই উপাদান থেকে উদ্ভূত ও সম-মর্যাদা সম্পন্ন। এই বিতর্কের সমাধানের জন্য সম্রাট কনষ্টানটাইন নিকায়াতে এক ধর্ম কাউন্সিলের আহ্বান জানান। উক্ত কাউন্সিলে আরিয়ান মতবাদ বর্জন করা হয় এবং আথানাসিয়াস-এর মতবাদ গ্রহণ করা হয়। খৃষ্টজগতের প্রধান গীর্জাগুলি বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক গীর্জা এই মতবাদ গ্রহণ করে।

সমগ্র মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম ইউরোপে প্রধান ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দাস-ভিত্তিক সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবাদর্শরূপে যে খৃষ্টধর্মের আবির্ভাব—সেই খৃষ্টধর্ম আবার মধ্যযুগের শ্রেণীবিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে টিকিয়ে রাখতে নিঃ-সন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে।

www.pathagar.com

সন্ন্যাসবাদ বা মঠতন্ত্র

খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের পাশাপাশি আরেকটি সংগঠন মধ্যযুগে ইউরোপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল সন্ন্যাসীদের সংঘ বা মঠ। গীর্জা ও মঠ—এ দুটি প্রতিষ্ঠান মধ্যযুগে খৃষ্টধর্মের প্রসার ও প্রচারে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল।

সন্ন্যাসীদের জীবন যাপন পদ্ধতিকে বলা হত সন্ন্যাসবাদ (Monaticism)। এটা একটা জীবনদর্শনও বটে। সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সম্ভোগ ও ভোগবিলাসের জীবন পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় বা নির্জন প্রান্তরে একাকী ঈশ্বরের চিন্তায় নিজেদের নিমগ্ন রাখতো। সন্ন্যাসবাদের প্রচলন ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ, চীন ও মিশরে দেখা গেলেও ইউরোপে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে এর আবির্ভাব ঘটেনি।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের শেষ পর্যায়ে সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী যে প্রচণ্ড নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা হয় তাতে কিছু নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ধারণা হয়, বস্তুই সকল পাপের উৎস। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে রোমান সম্রাট থেকে আরম্ভ করে অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ, দাসমালিক ও বৃহৎ ভূস্বামীগণ যে প্রচণ্ড ভোগবিলাস ও অনৈতিক জীবনে লিপ্ত ছিলেন তাতে এ ধরনের ধারণার উৎপত্তি কিছুমাত্র আকস্মিক ব্যাপার নয়। জনসাধারণের জীবনের উপর সকল দুর্ভোগের বোঝা চাপিয়ে এরা প্রচণ্ড বিলাসিতায় নিজেদের মগ্ন রেখেছিলেন তো বটেই, উপরন্তু বর্বরদের উপর্যুপরি আক্রমণের হাত থেকে নিরীহ জনগণকে রক্ষা করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা তারা করেননি। রোমান সম্রাটদের সীমাহীন অত্যাচার, নিপীড়ন ও তদুপরি বৈদেশিক আক্রমণের মুখে অসহায় জনগণের আত্মসমর্পণ প্রভৃতি মানুষের সম্মুখে এ ধারণা স্পষ্ট করে তোলে যে মানুষের পাপের বোঝা পূর্ণ হয়েছে এবং এ পাপই পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্যভাবে ডেকে আনছে। অতএব এ পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে জাগতিক জীবনকে পরিত্যাগ করে, পরিবারিক জীবনকে পরিহার করে আত্মার মঙ্গলের জন্য এবং পরকালে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের জন্য ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া।

যীশুখৃষ্টের বাণীও সন্ন্যাসবাদের উৎপত্তিতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। খৃষ্টধর্মে নিঃসঙ্গ জীবনকে গার্হস্থ জীবন অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে

www.pathagar.com

মনে করা হয়েছে আবার দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনবান ব্যক্তির তুলনায় ঈশ্বরের কাছে অধিকতর প্রিয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি গৃহী জীবনযাপন করে তার চেয়ে অবিবাহিত ও সঙ্গীহীন ব্যক্তি অধিকতর ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারে কিংবা একটা উটের পক্ষে একটা সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কোন ধনবান ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ সম্ভব নয়—এ ধরনের বাণী একশ্রেণীর লোকের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কাজেই যা কিছু পার্থিব, যা কিছু বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কিত, সবকিছু বর্জন করে শুধুমাত্র ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করা এবং সেই সাথে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করাই সর্বোত্তম পন্থারূপে বিবেচিত হয়েছিল।

প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ সবাই প্রায় সন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন করতেন। যীশুখৃষ্ট ও তাঁর অনুসারীগণ যাবতীয় ভোগবিলাস ত্যাগ করে অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে গেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ দেহকে নির্যাতনের পদ্ধতির আশ্রয় নেননি। কিন্তু সন্ন্যাসবাদের প্রাথমিক পর্বে আমরা যে সব সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ পাই তারা সবাই অত্যন্ত বর্বর পন্থায় নিতান্ত অমানুষিক উপায়ে নিজ দেহের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন। এ ধরনের সন্ন্যাসীদের বলা হত Hermit বা Anchorite (যোগী সন্ন্যাসী)। আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য এরা নানা রকম অদ্ভূত পদ্ধতিতে নিজ দেহকে নির্যাতন করত। প্রচণ্ড সূর্যের নীচে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকত। অথবা প্রচণ্ড শীতে পুকুর বা কোন জলাশয়ে অনাবৃত দেহকে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখত। পশুর মত তৃণভোজন করতো, কন্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে গড়াগড়ি দিত কিংবা বিষাক্ত সাপ ও অন্যান্য ভয়াবহ প্রাণীসঙ্কুল বনভূমিতে দিবারাত্র যাপন করত। বিখ্যাত সাধু সাইমন স্টাইলাইটিস পুরো গ্রীষ্মকাল একটি বাগানের মধ্যে গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর তিনি তাঁর বিখ্যাত স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করেন; এটি ষাট ফুট উঁচু পর্যন্ত নির্মিত হলে তিনি পরবর্তী ত্রিশ বছরের জীবনকাল এই স্তম্ভের উপর বসে কাটিয়ে দেন।

এ ধরনের দৈহিক নির্যাতন পদ্ধতির দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ কতখানি হত বলা কঠিন তবে প্রত্যক্ষ ফলাফল যে খুব শুভ হত না তা বলাই বাহুল্য।

www.pathagar.com

অধিকাংশই অচিরেই মৃত্যুবরণ করত এবং যারা বেঁচে থাকত তারাও শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে যেত।

এ ধরনের পরিণতিই শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে ধারণা পাল্টে দিতে সক্ষম হয়। চরম দৈহিক নির্যাতনের ফল শেষ পর্যন্ত যে শুভ হয় না এ চেতনাই পরবর্তীকালে প্রকৃত সন্ন্যাসবাদের জন্ম দেয়। দেহকে অযথা কষ্ট না দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জীবন যাপন করাই শ্রেয়—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পরবর্তী সন্ন্যাসীগণ একটি সংঘবদ্ধ জীবনযাপনে প্রয়াসী হন। এ সকল সন্ন্যাসীরাই ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসবাদের এবং মঠতন্ত্রের জন্মদাতা। এদের বলা হত Cerobite বা Monk।

সন্ন্যাসীদের জন্য সর্বপ্রথম যিনি একটি সংঘবদ্ধ জীবনের উপযোগী রীতিনীতি প্রচলন করেন তিনি হলেন সাধু বেসিল নামক কাপ্পাডোসিয়ার একজন বিশপ।

সাধু বেসিলের নিয়ম কানুনের মধ্যে ছিল একটি নিয়মসঙ্গত সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করা; দৈহিক পরিশ্রম করা; অযথা অনাহার বা অন্য কোন নির্যাতনের দ্বারা দেহকে কষ্ট না দেওয়া। দারিদ্র্যকে বরণ করে নেওয়া এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনায় নিয়োজিত থাকা।

পূর্ব ইউরোপের বহু স্থানে সাধু বেসিলের নিয়মে সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম ইউরোপের সন্ন্যাসীদের জন্য নিয়মনীতি প্রচলন করেন নার্সিয়ার সাধু বেনেডিক্ট, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। দক্ষিণ ইতালীর মন্টেক্যাসিনো নামক সন্ন্যাসীদের আশ্রমের তিনি ছিলেন প্রধান। তাঁর নিজ সংঘের জন্য তিনি যেসব নিয়ম কানুনের প্রচলন করেন সেগুলি পরবর্তীকালে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সংঘগুলিতে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করা হয়। সেন্ট বেনেডিক্ট-এর নিয়মগুলি ছিল মোটামুটি সাধু বেসিলের নিয়মনীতির অনুরূপ।

সন্ন্যাসীদের প্রাথমিকভাবে তিনটি প্রতিজ্ঞা নিতে হত। দারিদ্র্য পালন অর্থাৎ কেউ কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না; সতীত্বযাপন অর্থাৎ বিবাহিত জীবনযাপন করতে পারবে না; এবং প্রার্থনা ও উপাসনা। যেহেতু সবাই সন্ন্যাস জীবনের জন্য উপযুক্ত নয় সেহেতু সন্ন্যাসীদের দু বছরের জন্য প্রাথমিক নির্বাচনী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হত। যারা সসম্মানে এই প্রশিক্ষণ পর্ব সমাপ্ত করতে পারত শুধু তারাই এ সংঘ জীবনে প্রবেশ করতে পারত। এ

www.pathagar.com

সংঘজীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। সন্ন্যাসীদের দিনের অধিকাংশ সময় প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকতে হত। তাদের মঠের অধ্যক্ষের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হত। নিজেদের খাদ্য নিজেদের তৈরী করা, ঘরবাড়ী বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা সহ সর্ববিধ কাজ তাদের নিজের হাতে করতে হত। দৈহিক পরিশ্রমকে প্রার্থনার মতই আবশ্যকীয় বিবেচনা করা হত। তাদের উপর জ্ঞানের অনুশীলন ও পঠন পাঠনের নির্দেশ দেয়া ছিল। অতিথির সেবা, রোগীর পরিচর্যা ও দুঃস্থের সেবার কঠোর নিয়ম ছিল তাদের। সাধু বেনেডিক্ট প্রণীত এ নিয়মকানুনগুলি সন্ন্যাসীদের জন্য এতখানি উপযোগী ছিল যে প্রায় সকল সংঘই শাসনতন্ত্রের মত এ নিয়মগুলি গ্রহণ করেছিল।

প্রাথমিক যুগে সংঘ বা মঠগুলি অত্যন্ত অল্প পরিসরে গড়ে উঠলেও কালক্রমে এগুলি বিরাট বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হয়ে পড়ে। বহু ধনী ব্যক্তি এবং পরবর্তীকালে রাজা মহারাজা ও সামন্ত প্রভুরা পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে চার্চ ও মঠগুলিকে প্রচুর ভূমি দান করেন। মঠের সম্পত্তি বলে বিবেচিত এসব জমি থেকে লব্ধ সম্পদ মঠের সন্ন্যাসীরাই ভোগ করত। সন্ন্যাসীরা নিজের হাতে জমি চাষ করত, সেচের ব্যবস্থা করত, বীজ বুনত ও ফসল ফলাত। কিভাবে উৎকৃষ্ট রূপে ভূমি চাষ করে উন্নত বীজ ও উন্নত সেচের সাহায্যে অধিক ফসল ফলানো যায়, প্রতি নিয়তই তারা সে প্রচেষ্টা চালাত। কাপড় ও উল বুনন, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ইত্যাদি বিষয়ে তারা শিক্ষালাভ করেছিল। ফলে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও ধাতব দ্রব্য তারা নির্মাণ করত। প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়ার ফলে সন্ন্যাসীদের জীবন আর পূর্বের মত সরল অনাড়ম্বর রইল না। ক্রমশঃ ভোগবিলাস ও পার্থিব সম্পদে তারা লিপ্ত হয়ে পড়ল। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে এ মঠগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মধ্যযুগের অচল অর্থনৈতিক জীবনকে সবল রাখার অনেকখানি দায়িত্ব তারা বহন করেছিল। খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্য পরিবহন, বাজারজাতকরণ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তারা নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও চালিয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানদানকে তাদের আবশ্যকীয় কর্তব্য রূপে পালন করত। তারা স্কুল ও বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেছে। কেবল ধর্মজ্ঞান হলেও, জ্ঞানের আলোক শিখা সে অন্ধকার যুগে একমাত্র মঠগুলিই প্রজ্জ্বলিত রেখেছে। সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে

www.pathagar.com

প্রাচীন মূল্যবান দলিলপত্র ও গ্রন্থসমূহের অনুলিপি রচনা করেছে যদিও অনেক-ক্ষেত্রেই এগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। এ সকল দলিল সংরক্ষিত না হলে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনাই সম্ভব হত না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে গীর্জার পাশাপাশি মঠগুলিও খৃষ্টধর্মের প্রসার ও প্রচারে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করেছে। পোপের আনুকূল্য লাভের ফলে গীর্জা সংগঠন গুলির সাথে তারা একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

সর্বোপরি অনাথকে আশ্রয়দান, অসহায়কে সাহায্য দান, দুঃস্থ, বৃদ্ধ ও রোগীর পরিচর্যা প্রভৃতি জনসেবামূলক কাজের জন্য মধ্যযুগের প্রথম দিকের চরম দুর্গতির দিনগুলিতে মঠগুলিই ছিল সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসা-স্থল।

কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে এ সকল গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগের মঠগুলি একেবারে ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

প্রথমতঃ সন্ন্যাসীদের নিঃস্বার্থ কাজগুলি পুরোপুরি নিঃস্বার্থ ছিল না। তাদের সর্ববিধ কাজের পশ্চাতে একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল পুণ্য অর্জন করা। কাজেই মানবতার জন্য তারা আত্মোৎসর্গ করত একথা ভাবা নিতান্ত ভুল।

সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল যে সন্ন্যাসীরা ছিল প্রচণ্ড ধর্মোন্মাদ। খৃষ্ট-ধর্ম বিরোধী কোনকিছুই তারা সহ্য করতে পারত না তো বটেই উপরন্তু তা দমন করার জন্য সবচেয়ে নির্মম পদ্ধতির আশ্রয় নিত। পৌত্তলিক গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাথে সংযুক্ত সবকিছুই তাদের কাছে ছিল অসহনীয়। যুক্তি ও বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসীগণ গ্রেকো-রোমান সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুকেই নির্মমভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে।

এসব অসহিষ্ণু সন্ন্যাসীগণ গ্রীক ও রোমান ধর্মমন্দিরগুলি ধ্বংস করছে, প্রাচীন শিল্পকলার অনুপম নিদর্শনগুলি বিনষ্ট করেছে, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করেছে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিতাড়িত করেছে এবং চিরায়ত সাহিত্যগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এদের হাতেই আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত মহিলা গণিতবিদ হাইপেসিয়া নির্মমভাবে নিহত হন (৪১৫ খৃঃ)।

www.pathagar.com

ফ্রাঙ্কদের পরবর্তী ইতিহাস

ক্লভিসের মৃত্যুর পরে ফ্রাঙ্ক জাতির মেরোভিঞ্জিয়ান রাজবংশ আরও দেড়শ বছর রাজত্ব করে। কিন্তু তাদের রাজত্বকালের ইতিহাস শুধুমাত্র হত্যা, ষড়যন্ত্র আর বীভৎস অত্যাচারের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। রাজ্যময় এই অরাজকতার সুযোগে রাজার মন্ত্রীসভার সদস্য প্রাসাদের মেয়রগণ সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে এই মেয়রদেরই একজন চার্লস মারটেল ৭৩২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্পেনের মুসলিমগণ তাদের সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ফ্রান্সে প্রবেশ করে বোর্দো পর্যন্ত অধিকার করেন। মুসলিমদের অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবিলা করার মত শক্তি পদাতিক ফ্রাঙ্ক সৈন্য বাহিনীর ছিল না। অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার মত অর্থশক্তিও ফ্রাঙ্ক রাজাদের ছিল না। কারণ অকর্মণ্য ও বিলাসী রাজন্যবর্গ রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেলেছিল। চার্লস মারটেল তখন চার্চ সংলগ্ন বিশাল ভূমিখণ্ডগুলি রাজার নির্দেশবলে বাজেয়াপ্ত করে নেন। এই সকল ভূখণ্ডগুলি বিশ্বস্ত অনুচর ও ধনী প্রজাবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়, বিনিময়ে তারা রাজাকে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সাহায্য করে। এই নবগঠিত সৈন্যদল নিয়ে চার্লস মার্টেল তুরের (Tours) যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম সুলতানের সম্মুখীন হন। যুদ্ধে সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান নিহত হন এবং মুসলিম বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। ইতিমধ্যে স্পেনে মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে চার্লস ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করেন। তুরের যুদ্ধ শুধুমাত্র ফ্রাঙ্কদের সামরিক কৌশলই উন্নত করেনি। ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। অশ্বারোহী বাহিনী সংগ্রহ ও মোতায়েন রাখা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল বলে যারাই রাজার কাছ থেকে জমি পেতেন, তাদের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল, ইউরোপের নতুন রাজাকে প্রয়োজনের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা। সামন্ত প্রথার সামরিক ভিত্তি চার্লস মার্টেলই রচনা করেছিলেন।

রাজার নিকট থেকে প্রাপ্ত জমি ভূস্বামীগণ বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল করার অধিকার লাভ করেন।

ফ্রাঙ্ক রাজাদের অনুকরণে অধীনস্থ ভূস্বামীগণও নিজস্ব অনুগামী সম্প্রদায়

www.pathagar.com

গড়ে তুলতে শুরু করল। ভূস্বামীগণ অনুচরদের মধ্যে জমি বিতরণ করত, বিনিময়ে এ অনুচররা ভূস্বামীকে সামরিক সাহায্য প্রদান করত। এভাবে একটি বিশেষ সুবিধা ভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হল। অনুচরদের মধ্যে জমি বিতরণের উদ্দেশ্যে ফ্রাঙ্ক ভূস্বামীগণ স্বাধীন কৃষকদের জমি দখল করে নিত।

গায়ের জোরে জমি দখল ছাড়াও কৃষককে তার ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অনেক পন্থা এদের জানা ছিল। তারা যে কোন উপায়ে দরিদ্র কৃষককে বিপদে ফেলত বা তাদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দিত অথবা ঋণের জালে বেঁধে ফেলত। কৃষক তার জমিটুকু জমিদারের হাতে অর্পণ না করা পর্যন্ত জমিদার তাকে রেহাই দিত না। এভাবে সমগ্র দেশের জমি গুটিকতক ভূস্বামীর হাতে সঞ্চিত হল। আর দেশের অগণিত দরিদ্র কৃষক ভূমিহীন প্রজায় পরিণত হল। জমিদার আবার জমিগুলি কৃষকদের মধ্যে চাষাবাদের জন্য বিলি করল, কিন্তু জমির মালিক এখন জমিদার, কৃষকরা নয়। এভাবে নিজেদের জমিকৃষকরা চাষ করার অনুমতি পেল, কিন্তু অগণিত শর্তের জালে তারা বাঁধা পড়ল

চার্লস মার্টেলের পুত্র পিপিনের সময়ই এই জমি দখল পর্বটি অধিক মাত্রায় সংঘটিত হয়। তার রাজত্বকালেই এই সংঘবদ্ধ জমিদার তথা সামরিক শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের সাহায্যেই পিপিন দি শর্ট অযোগ্য মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাকে অপসারিত করে ফ্রাঙ্করাজ্যের সিংহাসন দখল করেন (৭৫১ খৃঃ)। এই নূতন রাজবংশ ইতিহাসে ক্যারোলিঞ্জিয়ান বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ক্যারোলাস ম্যাগনাস বা শার্লামেন (Charles magne)-এর নাম থেকে ক্যারোলিঞ্জিয়ান নামের উৎপত্তি।

সিংহাসন দখল কার্যে পিপিন পোপের আশীর্বাদ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ ইতিপূর্বে লম্বার্ড রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পোপ যখন নিজে সিংহাসনচ্যুত হন তখন পিপিনই লম্বার্ড রাজাকে পরাজিত করে পোপের রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন। পিপিনের পুত্র শার্লামেন ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্ব কালে তিনি পঞ্চাশটির অধিক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ফ্রাঙ্ক রাজ্যের পরিধি বর্ধিত করা এবং সাথে সাথে অধিক ভূখণ্ড দখল করাই ছিল তাঁর সামরিক অভিযানের লক্ষ্য।

www.pathagar.com

প্রায় প্রতি বৎসরই শার্লামেন যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন। তাঁর বিশাল সামরিক বাহিনী দু'বার আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে ইতালী আক্রমণ করে এবং লম্বার্ড রাজ্য সহ উত্তর ইতালীর বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করে।

তিনি জার্মানীর ব্যাভারিয়া জয় করেন এবং বোহেমিয়ানদের কর দিতে বাধ্য করেন। কিন্তু স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে শার্লামেনের অভিযান ছিল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্ঠুরতম। স্যাক্সনগণ রাইন ও এল্‌ব্ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। সমগ্র বর্বর জাতির মধ্যে একমাত্র এরাই কেবল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি। খৃষ্টধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শার্লামেনের কাছে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছুই ছিল না।

স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে সর্বমোট আটটি সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়। শার্লামেন শুধু স্যাক্সনদের পরাজিত করেননি, তাদের উপাসনালয়, বিগ্রহ মূর্তি প্রভৃতি নির্মমভাবে ধ্বংস করেন। এই বিশাল সামরিক বাহিনীর হাতে পরাজিত ও বিধ্বস্ত স্যাক্সনগণ শার্লামেনের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হল। কিন্তু ফ্রাঙ্ক সৈন্যরা দেশে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। স্যাক্সনগণ ফ্রাঙ্কদের নির্মিত দুর্গগুলি ভেঙ্গে ফেলল এবং খৃষ্টান পুরোহিতদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। এর প্রতিশোধে শার্লামেন স্যাক্সনদের নির্মমভাবে দমন করেন। তাঁর নির্দেশে একদিনে সাড়ে চার হাজার বন্দীকে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয়, দশ হাজার বন্দী পরিবারকে ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের দূর দূরান্তে নির্বাসিত করা হয়। সমগ্র স্যাক্সন রাজ্যে ফ্রাঙ্কদের বসতি স্থাপন করা হল। নিষ্ঠুর আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে কোন রকমের বিদ্রোহের সম্ভাবনা রহিত করা হয়। এ কার্যে শার্লামেন ফ্রাঙ্ক ভূস্বামী ব্যতীত খৃষ্টান ধর্মপুরোহিতদেরও সাহায্য লাভ করেন। পুরোহিতগণ স্যাক্সনদের ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং সমগ্র স্যাক্সন রাজ্যে অসংখ্য চার্চ ও মঠ গড়ে তোলেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণে কেউ বিন্দুমাত্র আপত্তি প্রদর্শন করলে তাকে সাথে সাথেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত।

শার্লামেন পীরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে স্পেনের মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু এক্ষেত্রে সফলকাম হতে পারেননি। তিনি শুধুমাত্র পীরেনিজ পর্বতের দক্ষিণের ক্ষুদ্র একটি ভূভাগ জয় করতে সক্ষম হন। শার্লামেন তাঁর রাজত্বকালে ডেনীসদের আক্রমণও প্রতিহত করেন। শুধুমাত্র ইংরেজ ব্যতীত ইউরোপে এমন কোন জাতি ছিল না যাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

শার্লামেন যুদ্ধ করেননি। তাঁর মৃত্যুকালে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য এতদূর বিস্তার লাভ করেছিল যে তার পরিসীমার মধ্যে বর্তমান ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেনের একাংশ এবং ইতালীর রোম পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮০০ খৃষ্টাব্দে শার্লামেন বড়দিনের উৎসবে যোগদানের জন্য রোমে গমন করেন। ইতিপূর্বে তিনি রোমের বিক্ষুব্ধ জনগণ কর্তৃক বিতাড়িত পোপকে নিজ পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। বড়দিনে রোমের সেন্ট পিটার্স চার্চে প্রার্থনা সমাপনান্তে যখন শার্লামেন মস্তক উত্তোলন করেন ঠিক তখনই পোপ তাঁর মস্তকে রোমান সম্রাটের স্বর্ণমুকুট পড়িয়ে দেন। উপস্থিত জনতা তাঁকে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে মহান ও শান্তিপ্রিয় রোমান সম্রাট নামে অভিনন্দিত করে। মধ্যযুগের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞের নায়ককে শান্তিপ্রিয় ও মহান সম্রাট নামে বরণ করা হল। শার্লামেন যদিও পোপের দ্বারা রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হওয়া পছন্দ করেননি, তথাপি, সম্রাট হওয়ার পুরোপুরি বাসনা তাঁর অন্তরে ছিল। যদিও রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান আর কোন-ভাবেই সম্ভব ছিল না, তথাপি রোমের জনগণের মনে রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবের স্মৃতি এতখানি জাগরূক ছিল যে শার্লামেন কর্তৃক স্থাপিত সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্য নামে অভিহিত করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। পূর্বতন পৌত্তলিক রোমান সাম্রাজ্যের সাথে এর পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য এ সাম্রাজ্যকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালের জার্মান সম্রাট অটো দি গ্রেটই ছিলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সত্যিকার প্রতিষ্ঠাতা।

শার্লামেনের সাম্রাজ্য যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বর্বর জাতির মধ্যে কিছুকালের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

শুধুমাত্র রাজ্যজয়েই শার্লামেনের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি একটি উৎকৃষ্ট এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ শাসন ব্যবস্থায় সম্রাটের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। পুরাতন বর্বর গোষ্ঠীপতিদের হাতে যে শাসন ক্ষমতা ছিল শার্লামেন তা পুরোপুরি বাতিল করে সর্বত্র তিনি নিজে উপর থেকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। জেলা বা কাউন্টির শাসনকর্তাদের নাম ছিল কাউন্ট। কয়েকটি কাউন্টি নিয়ে গঠিত ছিল ডাচি (Dutchi), এবং এর শাসনকর্তার নাম ছিল ডিউক।

www.pathagar.com

কাউন্ট ও ডিউকগণ সরাসরি সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত হতেন এবং যে কোন সময়ে সম্রাট তাঁদের অপসারণ করতে পারতেন। সীমান্ত রক্ষাকার্যে নিযুক্ত অফিসারদের বলা হত মারগ্রেভ (Margrave)। এ ছাড়া একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী ছিল, তাদের বলা হত মিসি ডমিনিসি (Missi Dominici)। এরা রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে সর্ববিধ অবস্থা সম্রাটকে জানাত। এরা গুপ্তচরের মত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শাসনকর্তাদের কার্যাবলীর বিবরণ এমনকি রাজস্ব আদায়ের পুরোপুরি বিবরণ শার্লামেনের নিকট পেশ করত। বিশ্বস্ত কর্মচারীদের শুধু এ কাজে নিযুক্ত করা হত এবং এদের সাহায্যেই শার্লামেন এতবড় বিশাল ভূখণ্ডে নিজের পুরোপুরি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ ছাড়া যাজকশ্রেণীর উপর তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি প্রায়শঃই ধর্মসভা আহ্বান করতেন এবং তাতে চার্চ সম্বন্ধীয় যাবতীয় নিয়ম-কানুন নিজে নির্ধারণ করতেন। নিজে অশিক্ষিত হলেও শার্লামেন শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ স্কুলে অ্যালকুইন অব ইয়র্ক-এর মত পণ্ডিতবর্গ অধ্যাপনা করতেন।

কিন্তু শার্লামেনের সকল কৃতিত্ব তাঁর মৃত্যুর পর পরই অস্তমিত হয়। যখন বিকেন্দ্রীভূত সামন্ত ব্যবস্থা তার পুরোপুরি রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল, সে সময়ে এত বড় সাম্রাজ্যে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা শুধুমাত্র শার্লামেনের অপরিসীম ব্যক্তিত্বের দরুনই টিকে ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সামন্তপ্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। স্থানীয় কাউন্ট ও ডিউকগণ নিজেরাই নিজস্ব এলাকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন এবং শার্লামেনের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন। এভাবে ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

এ ছাড়া ফ্রাঙ্কদের অদ্ভুত উত্তরাধিকারী প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক পুত্রের সিংহাসনে সমান অংশ ছিল। শার্লামেনের একমাত্র পুত্র ছিলেন ধার্মিক লুই। 'ধার্মিক লুই'-এর মৃত্যুর পর বিশাল ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্য তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। টাক মাথা চার্লস (charles the Bald) পেলেন পশ্চিমের অংশ অর্থাৎ পুরো ফ্রান্স ও স্পেনের কিয়দংশ; অপর পুত্র

www.pathagar.com

লুই পেলেন পূর্ব অংশ অর্থাৎ পুরো জার্মানী এবং জ্যেষ্ঠপুত্র লথেয়ার পেলেন বার্গাণ্ডির রাজ্যগুলি, উত্তর ইতালীর রাষ্ট্রসমূহ, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ। সম্রাট উপাধিও লথেয়ারই পেলেন। ভার্দুনের চুক্তি অনুযায়ী এ বিভক্তিকরণ সম্পন্ন হয়। এ চুক্তির শর্তাবলী দুটি ভাষায় প্রকাশিত হয়ঃ ফরাসী ও, জার্মান এবং এই দুটি দেশের মধ্যকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এখান থেকেই শুরু হয়।

পরবর্তী ক্যারোলিঞ্জিয়ান রাজাদের সময়ে এ অংশগুলি আরও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি রাজ্য এক একটি সামন্ত রাষ্ট্রেরই রূপ নেয়।

ঠিক এ সময়েই শুরু হয় নর্ম্যানদের আক্রমণ। ইউরোপের উত্তর থেকে আগত এই নতুন জাতির আক্রমণে ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের বাকী অংশটুকুও তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে।

জার্মান জাতির অবদান

এ পর্যন্ত আমরা বর্বর জার্মান জাতির পশ্চিম ইউরোপে সামরিক অভিযান ও রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করেছি। আপাতদৃষ্টিতে জার্মানগণ কর্তৃক রোমান সাম্রাজ্য দখলে কাহিনী যতই নিষ্ঠুর মনে হোক না কেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঘুনেধরা, অবক্ষয়িত রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে জার্মানগণ সভ্যতার অগ্রগতির পথই প্রশস্ত করেছে। সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের বিচারে রোমানদের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে উঁচুমানের ছিল, তাদের বাহ্যিক রূপ ছিল চাকচিক্যময়, কিন্তু এর আভ্যন্তরীণ রূপ ছিল অতি কদর্য ও পঙ্কিল। সাম্রাজ্যের জনগণের বিরাট অংশকে ক্রীতদাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রোমানগণ আপাতঃ দৃষ্টিতে যে বৈভবময় ও ঐশ্বর্যপূর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা শেষ পর্যন্ত তার নিজেরই পতন ডেকে এনেছিল। বর্বরদের আক্রমণ সে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল মাত্র। কাজেই জার্মান জাতির অভিযানে একদিকে যেমন প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছিল অন্যদিকে এ ধ্বংসের আড়ালে অতি ধীরে ধীরে চলছিল ভবিষ্যৎ সভ্যতার প্রস্তুতি পর্ব। এ সভ্যতা মধ্যযুগের সামন্ত সভ্যতা—আধুনিক মাপকাঠিতে নিকৃষ্ট বলে মনে

www.pathagar.com

হলেও প্রাচীন দাসভিত্তিক সমাজের মানদণ্ডের বিচারে নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটি উঁচুদরের সভ্যতা। প্রাচীন গ্রেকো রোমান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও মধ্যযুগীয় সভ্যতায় সবচেয়ে বেশী অবদান ছিল বর্বর জার্মান জাতির।

জার্মানগণ তাদের নিজস্ব ভাব ধারা, রীতিনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। এর অনেকগুলিই তারা প্রবর্তিত করেছিল বিজিত দেশে তাদের রাজ্য গড়ে তোলার সময়ে। এর বহুলাংশ ইউরোপ গ্রহণ করেছিল যেমন সে এককালে গ্রহণ করেছিল বহিরাগত এট্রুস্কান, গ্রীক ও অন্যান্যদের কলাকৌশল।

মধ্যযুগের সভ্যতার ক্ষেত্রে জার্মানদের সবচেয়ে বড় অবদান তারা নিজেরাই। একটি নব্য, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের অধিকারী বিজেতা জাতি হিসাবে ইউরোপে তাদের আগমন নিঃসন্দেহে অচল ও নিরুদ্ধগতি ইউরোপীয় সমাজকে সক্রিয় ও সচল করে তুলেছিল। জার্মানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা রোমানদের তুলনায় ছিল উদার ও গণতান্ত্রিক।

গোষ্ঠীভিত্তিক জার্মান সমাজের দলপতির প্রভাব থাকলেও সর্বসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় ও সাধারণ পরিষদই ছিল প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। গোষ্ঠী নেতা, এমন কি রাজাদেরও নির্বাচিত করত এই পরিষদ। রোমানদের মত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র জার্মানদের ছিল না। সর্ববিধ আইন প্রণয়ন এমনকি বিচার বিভাগের কাজও ছিল সাধারণ পরিষদের উপর অর্পিত। পরবর্তী-কালে বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডস্ ও হাউস অব কমন্স কর্তৃক যুগ্ম-ভাবে সময়ে সময়ে বিচার কার্য পরিচালনার যে দৃষ্টান্ত আমরা ইতিহাসে পাই তা সম্ভবতঃ জার্মানদের প্রথার অনুকরণেই হয়েছিল। নির্বাচিত রাজতন্ত্রের প্রথাও পরবর্তী যুগে জার্মানীর রাজা ও পবিত্র রোমান সম্রাটের নির্বাচন পদ্ধতির সূচনা করে। স্থানীয় পরিষদগুলিও স্থানীয়ভাবে বিচার কার্যের ভারপ্রাপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, বিচার বিভাগ সম্বলিত শায়ার (Shire) গুলি গড়ে ওঠে জার্মানদের স্থানীয় পরিষদগুলির প্রভাব তাদের উপর প্রতি-ফলিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা জার্মানদের আরেকটি বিশেষ রাজনৈতিক অবদান। রোমানদের মধ্যে এ ধরনের প্রথা বিশেষভাবে অনুপস্থিত ছিল।

www.pathagar.com

রোমান সাম্রাজ্যে একমাত্র রোম নগরের স্বাধীন নাগরিকগণ সিনেট সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন করত। অন্য সব নগর বা প্রদেশের নাগরিকগণ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আর ক্রীতদাসদের তো কোন রকম ভোটাধিকারই ছিল না। কিন্তু সমগ্র জার্মান জাতির ভোটে তাদেরই মধ্য থেকে নির্বাচিত হত সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ। পরবর্তীকালে আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

জার্মানদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি তাদের আইন। প্রাথমিক যুগে জার্মানদের আইন ছিল বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ পদ্ধতির বিচারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোমান আইনের তুলনায় একটিমাত্র ক্ষেত্রে সেগুলি উৎকৃষ্টতার দাবী রাখে—তা হল জার্মান আইনগুলি কোন সম্রাট বা রাজা কর্তৃক প্রণীত নয়। এগুলি প্রণীত হয়েছিল সাধারণ পরিষদের দ্বারা অর্থাৎ জনগণের দ্বারা কারণ সাধারণ পরিষদ সর্বসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত হত। জার্মান আইন জনগণের তৈরী এবং জনগণের প্রতিনিধিরা ছিলেন এর একমাত্র প্রয়োগকর্তা; জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক এগুলি প্রণীত বা কার্যকর করা হয়নি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জার্মান আইন শেষ পর্যন্ত ইউরোপে টিকে থাকেনি। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে নতুনভাবে সঙ্কলিত এবং পরিশোধিত রোমান আইন এর স্থান দখল করে নেয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে জার্মান বর্বরদের অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রোমানদের প্রচলিত ক্রীতদাস প্রথার সাথে জার্মানগণ পরিচিত ছিল না। কাজেই যে অবক্ষয়িত, ঘৃণিত, অপ্রয়োজনীয় ক্রীতদাস ব্যবস্থা রোমানগণ পরিহার করতে পারেনি জার্মানগণ তা সহজেই বর্জন করেছিল। তারা প্রবর্তন করেছিল একটি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা। উৎপাদনের হাতিয়ারকে তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল সর্বসাধারণের মধ্যে। উৎপাদনের যে সঙ্কট ক্রীতদাস প্রথা বলবৎ থাকার দরুন রোমানরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি জার্মানরা ক্রীতদাস প্রথাকে পরিহার করে অতি সহজেই সে সঙ্কট অতিক্রম করতে পেরেছিল। পরবর্তী কালে মধ্যযুগে যে সামন্ত প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল তার কিছুটা ভিত্তি রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রচিত হলেও এ প্রথার উৎপত্তির পশ্চাতে বর্বরদের

www.pathagar.com

যে বিশেষ ভূমিকা ছিল সামন্ত প্রথার ইতিহাস বর্ণনাকালে আমরা সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করব।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও জার্মানদের অবদান অস্বীকার করার মত নয়। এদের সবচেয়ে বেশী অবদান ভাষার ক্ষেত্রে। রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত ভাষা ছিল ল্যাটিন। প্রত্যেকটি জার্মান জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। এক এক অঞ্চলের জার্মান-দের নিজস্ব ভাষার সাথে ল্যাটিন ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল পরবর্তী কালের ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় ভাষা—যেমন, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, স্পেনীয়, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষা। বিভিন্ন জার্মান জাতির নাম অনুসারে পশ্চিম ইউরোপের এক একটি দেশ বা অঞ্চলের নামও গড়ে উঠে-ছিল। অ্যাঙ্গলদের দেশ হল ইংলণ্ড, ফ্রাঙ্কদের দেশ ফ্রান্স নামে (পূর্ব নাম গল) পরিচিত হল। লম্বার্ডদের নাম অনুযায়ী ইতালীর একটি প্রদেশ হল লম্বার্ডী; স্পেনের একটি অঞ্চল ভ্যাণ্ডালদের নাম অনুসারে ভ্যাণ্ডালুসিয়া বা আন্দালুসিয়া নামে পরিচিত হল। খোদ জার্মানীতে স্যাক্সনদের নামে একটি অঞ্চলের নাম হল স্যাক্সনী।

গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে মিশ্রিত হয়েছিল জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আরও পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নর্ম্যান নামক আরেকটি বর্বর জাতির ঐতিহ্য। এ সবের মিলিত সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল মধ্যযুগের সংস্কৃতি এবং তা পরবর্তীকালে আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির পথ উন্মুক্ত করেছিল।

নর্ম্যান জাতির আক্রমণ

খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপ আরেকবার বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হল। এবারের আক্রমণকারীরা ছিল উত্তর থেকে আগত নর্থম্যান বা নর্ম্যান জাতি। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীগণকে মধ্যযুগে সাধারণভাবে নর্ম্যান বলা হত।

www.pathagar.com

ইতিহাসে এরা 'ভাইকিং' নামেও পরিচিত। জাতিগতভাবে তারা বর্বর টিউটন জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তারা অন্যান্য জার্মানদের থেকে পৃথক ছিল।

নর্ম্যানগণ টিউটনদের আদিম রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধিকারী ছিল। অন্যান্য জার্মানগণ যেখানে বহু শতাব্দী ধরে রোমান সভ্যতা ও খৃষ্টান সভ্যতার কাছাকাছি বাস করে এসেছে, নর্ম্যানগণ সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল থেকে বসবাস করে এসেছে। নবম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ ভূখণ্ড অপরাপর ইউ-রোপবাসীদের কাছে পুরোপুরি অজ্ঞাত ছিল। অনুর্বর পার্বত্যভূমি বছরের অধিকাংশ সময়েই বরফে আচ্ছন্ন থাকত। অধিবাসীগণ সাধারণতঃ উপকূল অঞ্চলে বসবাস করত। উপকূল ভাগ ভগ্ন হওয়ায় অভ্যন্তরভাগে বহুদূর পর্যন্ত খাঁড়ি প্রবেশ করত। ফলে এ অঞ্চল নৌচলাচল এবং মাছ ধরার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুপালন ও মৎস্যশিকার। সামান্য কৃষিকার্য অবশ্য ছিল, কিন্তু তাতে ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির ভরণপোষণ সম্ভব ছিল না। ফলে, দুর্ভিক্ষ ও অনাহার এদেশগুলির জনগণের চিরসাথী ছিল। উপরন্তু সমুদ্র নিকটবর্তী হওয়ার ফলে প্রথম থেকেই তারা নৌকা বা ছোটখাট জাহাজ নিয়ে নিকটবর্তী দ্বীপ-গুলিতে আক্রমণ চালাত। পরবর্তীকালে দলে দলে তারা সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া রাজনৈতিক কারণও তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করে। নবম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত নর্ম্যানগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বাস করত। নবম শতাব্দীতে তাদের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কতকগুলি গোষ্ঠীকে একত্রিত করে। এভাবে নরওয়ে সুইডেন ও ডেনমার্কে তিনজন স্বতন্ত্র রাজার অধীনে তিনটি পৃথক রাজ্য স্থাপিত হল। কিন্তু কয়েকটি গোষ্ঠী এ ধরনের অধীনতা স্বীকার করতে রাজী না হওয়ায় তাদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য দেশত্যাগ করতে বাধ্য হল।

নর্ম্যানগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুইডেনবাসীরা বাল্টিক সাগর অতিক্রম করে পূর্বদিকে রাশিয়ার উপর দিয়ে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পৌঁছাল। ডেনমার্কবাসীগণ জার্মানির নদীগুলির মোহনায়

www.pathagar.com

তাদের ঘাটি তৈরী করে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে ফ্রান্সের উত্তরে অবস্থিত ব্রিটানীর উপকূল পর্যন্ত পৌঁছায়। সবশেষে নরওয়েবাসীগণ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়।

নর্ম্যানগণের প্রধান কাজ ছিল প্রথমতঃ দস্যুবৃত্তি। যেখানে তারা উপস্থিত হত সেখানেই তারা লুটতরাজ ও অগ্নি সংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে ত্রাসের সৃষ্টি করত। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল মঠ ও চার্চ-সমূহ। কেননা এগুলিতে প্রচুর ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল। প্রথমদিকে নর্ম্যানগণ প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালে অভিযানে বের হত এবং শীতের শুরুতেই লুটের সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেত। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে নর্ম্যানগণ তাদের অধিকৃত অঞ্চলে শীতকালেও বসবাস করতে আরম্ভ করল। এজন্য তারা সেখানে দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরী করতে শুরু করল। এ ঘাঁটিগুলো থেকেই তারা চতুর্দিকে তাদের আক্রমণ-অভিযান পরিচালনা করত। প্রথমদিকে তারা কেবলমাত্র উপকূলবর্তী স্থানেই তাদের ঘাঁটি তৈরী করত। কিন্তু ক্রমশ যতই তাদের সামরিক শক্তির কাছে ইউরোপবাসীগণ পরাজয় বরণ করতে শুরু করল, ততই তারা দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করতে শুরু করল। উপকূলভাগ বার বার নর্ম্যানদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে লোকজন প্রাণ ভয়ে ভূখণ্ডের অভ্যন্তরভাগে পালাতে শুরু করল। নর্ম্যানগণও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে শহর ও গ্রামগুলির উপর আক্রমণ চালাতে লাগল।

নর্ম্যানদের যে দল পূর্বদিকে অভিযান শুরু করেছিল তাদের একটি শাখা বাল্টিক সাগর অতিক্রম করে যে ভূখণ্ডে পৌঁছায় পরবর্তীকালে তা রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের দলপতি 'রুরিক' সর্বপ্রথম ফিন, ল্যাপ, এস্কিমো, লেট প্রভৃতি জাতিকে একত্রিত করে একটি রাজ্য স্থাপন করে। রুরিকের বংশধরগণ পরবর্তী সাতশ' বছর পর্যন্ত সে দেশে রাজত্ব করেছিল। রুরিক ও তার দলবল রাশিয়ার আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ইলম্যান হ্রদের ধারে নভগরধ এবং নীপার নদীর তীরে কিয়েভ শহর স্থাপন করে। এগুলি পরবর্তীকালে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ব ও দক্ষিণে অভিযানকালে নর্ম্যানগণ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত উপনীত হয়। কিন্তু বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সামরিক

www.pathagar.com

ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় থাকার ফলে এর উপরে নর্ম্যানদের আক্রমণ ফলপ্রসূ হয়নি। তবে বাইজেন্টীয়দের সংস্পর্শে আসার ফলে নর্ম্যানগণ খৃষ্টধর্ম ও সভ্যতার আলোক লাভ করে।

দশম শতাব্দীতে একদল নর্ম্যান ভল্গা নদীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের এক অংশের উপর আক্রমণ চালায়। বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পথটিতে নর্ম্যানগণ স্থানে স্থানে তাদের বসতি স্থাপন করে এবং এভাবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে কনস্টান্টিনোপল ও আরও পূর্বদিক পর্যন্ত একটি দীর্ঘ ভ্রমণ ও বাণিজ্য পথ তৈরী হয়। উত্তরের দেশগুলি থেকে আগত তীর্থযাত্রীগণ প্যালেষ্টাইনে পৌঁছুবার জন্য এ পথটিই ব্যবহার করত।

পশ্চিমদিকে নর্ম্যানদের অভিযান শুরু হয় ৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে। তারা প্রথমে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের হেব্রিড্‌স্, ওর্কনী ও শেটল্যাণ্ড দ্বীপে বসতি স্থাপন করে। সেখান থেকে তারা স্কটল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। একশত বছরের মধ্যে নর্ম্যানদের বসতি এ সকল স্থানগুলি একত্রিত হয়ে একটি রাজ্যে পরিণত হয়। নবম শতাব্দীতে নর্ম্যানগণ আইসল্যাণ্ড ও দশম শতাব্দীতে গ্রীনল্যাণ্ড দখল করে। খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দে নর্ম্যানগণ আট-লান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তারা উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

পশ্চিমে অভিযানকারী নর্ম্যানদের একটি শাখা ডেনিস্ বা দিনেমার (ডেন-মার্কবাসী) নামে পরিচিত ছিল। ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে এরা প্রথম ইংল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলে তাদের আক্রমণ চালায়। এদের আক্রমণ ক্রমশঃ জোরদার হতে থাকে। ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ ইংল্যাণ্ডের উপকূলে তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করে। তারা প্রথমে নর্দামব্রিয়া দখল করে। পরে পূর্ব অ্যাঙ্গুলিয়া ও ফেন আক্রমণ ও ধ্বংস করে। এখানকার বিখ্যাত মঠগুলি লুন্ঠন করার পর তারা পূর্ব অ্যাঙ্গলিয়ার রাজা এডমাণ্ডকে হত্যা করে। ৮৭০ খৃষ্টাব্দে মার্সিয়ার রাজা দিনেমারগণকে প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে ও তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করেন বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দিনেমারগণ টেমস নদীর উত্তরদিকের সমস্ত ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব অ্যাঙ্গলিয়ার দিনেমার রাজা ওয়েসেক্স আক্রমণ করে। ওয়েসেক্স-এর রাজা অ্যালফ্রেড দি গ্রেট যুদ্ধে দিনেমারদের পরাজিত করতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হলেও টেম্‌স্-এর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব

সামন্ততন্ত্রের পরিচয়

সামন্ত প্রথার অভ্যুদয় মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সামন্ততন্ত্র শুধু ইউরোপেই গড়ে ওঠেনি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ঠিক একই রূপ নিয়ে গড়ে না উঠলেও কাছাকাছি রূপ নিয়ে সামন্ত-প্রথার আবির্ভাব ঘটেছিল।

ইউরোপে সামন্তপ্রথার উৎপত্তি কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত; এশিয়ার চীনদেশে ৩য় শতাব্দী, ভারতে ৪র্থ ও ৫ম শতক, এবং আরব দেশে ৭ম শতাব্দী থেকে সামন্তপ্রথার উৎপত্তি শুরু হয়।

দশম শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বৃহৎ ভূস্বামীদের দখলে চলে যায়। কৃষিযোগ্য ভূমি, বনজঙ্গল, পতিত জমি, নদীনালা, খাল বিল—ভূখণ্ডের সংলগ্ন এ সমস্ত কিছুর মালিক হয়ে পড়লেন সামন্ত প্রভুরা। এদের অধীনে অগণিত কৃষককুল সে সকল জমি চাষাবাদ করত, বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলের বিরাট অংশ সামন্ত প্রভুদের দিতে হত। সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ এ কৃষকদের জমির উপর কোন স্বত্ব থাকত না।

প্রত্যেক সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ ভূখণ্ডকে ফিউড (Feud) বলা হত। ফিউড বলতে সামন্ত পদও বোঝায়। এই ফিউড শব্দ থেকে ফিউডাল (সামন্ত) শব্দের উৎপত্তি। জমির মালিকানা কার হাতে তা থেকেই সামন্ত সম্পর্ক স্থির করা হত।

সামন্ত প্রথার তত্ত্ব অনুযায়ী রাজাই সমস্ত ভূখণ্ডের মালিক। তবে, রাজা তার জমির অধিকাংশ তার অধীনস্থ সামন্ত প্রভুদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন কতকগুলি শর্তের বিনিময়ে। রাজার কাছ থেকে জমি পেতেন ডিউক, কাউন্ট, আর্ল, মারগ্রেভ প্রভৃতিরা। তাদের বলা হত টেনান্টস-ইন-চীফ এরা আবার তাদের জমির অধিকাংশ বিতরণ করতেন ব্যারন, ভাইকাউন্ট প্রভৃতির কাছে। এভাবে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ জমি বিতরণ কার্য সম্পন্ন হত। সর্বশেষে যিনি জমি পেতেন তাকে বলা হত নাইট। নাইটের জমি আর বিতরণ করা যেত না।

এই জমি বিতরণ কার্যে যিনি জমি দিতেন তিনি ছিলেন লর্ড ও যিনি জমি পেতেন তাকে বলা হত ভ্যাসাল। ভ্যাসালকে বাংলায় সামন্ত বলা চলে।

www.pathagar.com

সামন্ত তত্ত্ব অনুযায়ী রাজা ব্যতীত সকল সামন্ত প্রভুই কারো না কারো ভ্যাসাল; এবং নাইট ছাড়া সকল সামন্ত প্রভুই কারো না কারো লর্ড। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও সর্বদা পরিলক্ষিত হত। একই ভ্যাসাল এমন অনেক অনেক সামন্ত প্রভুর কাছ থেকে জমি নিতেন যাদের সবাই একই সামন্ত পদ-মর্যাদাভুক্ত হতেন না। অনেকে হয়ত সেই ভ্যাসাল-এর পদ মর্যাদা সম্পন্ন। অনেক সামন্ত ভ্যাসাল আবার এমন প্রভুর কাছ থেকে জমি নিতেন যাদের কাছ থেকে তার অন্যান্য সামন্ত প্রভুরাও জমি নিয়েছেন। আবার সামন্ত-প্রথায় যদিও রাজা কারও ভ্যাসাল হতে পারতেন না, তথাপি ইংল্যাণ্ডের রাজা দীর্ঘদিন ফ্রান্সের রাজার ভ্যাসাল হয়েছিলেন।

সামন্তপ্রথার নিয়মগুলি ইউরোপের সব দেশে একই ভাবে প্রচলিত ছিল না। একমাত্র ফ্রান্সেই এর সবদিকগুলি পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেছিল।

লর্ড এবং ভ্যাসাল উভয়েরই উভয়ের প্রতি কর্তব্য ছিল। লর্ডের প্রধান কর্তব্য ছিল বহিঃশত্রু বা অন্যান্য লর্ডের আক্রমণ থেকে তার ভ্যাসালকে রক্ষা করা; ভ্যাসাল-এর মৃত্যু ঘটলে তার নাবালক সন্তানদের অভিভাবক হওয়া ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং ভ্যাসাল তার কর্তব্য পালন না করলে নিজস্ব আদালতে তার বিচার সম্পন্ন করে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা বা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ভ্যাসাল এর সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল অস্ত্র ও বর্মসজ্জিত অশ্বারোহী সামরিক বাহিনী লর্ডকে সরবরাহ করা; যুদ্ধে লর্ডকে অনুসরণ করা ও লর্ড বন্দী হলে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করা; এবং লর্ডের আদালতে তাকে বিচার-কার্য সম্পন্ন করতে সাহায্য করা। এ ছাড়া লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাইট উপাধিতে দীক্ষিত হওয়ার অনুষ্ঠানের এবং জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের খরচের একটি প্রধান অংশ বহন করাও ভ্যাসাল এর অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। জমির বিতরণ কার্যটি সম্পন্ন হত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তাকে বলা হত হোমেজ (Homage)। লর্ডের সামনে খালি মস্তকে নতজানু হয়ে তার ভবিষ্যৎ প্রভুর পায়ের দিকে হস্ত প্রসারিত করে ভ্যাসাল চিরদিন তার অনুগত হয়ে থাকার প্রতিজ্ঞা করত। প্রভু তার মস্তক চুম্বন করে তাকে তার জমি দিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তাকে চিরদিন নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা দিতেন। জমি পাওয়ার সাথে সাথে ভ্যাসাল তার প্রভুর কাছ থেকে কতকগুলি স্বাধীনতা লাভ করত; নিজের ভূখণ্ডে ভ্যাসাল ইচ্ছামত সৈন্য মোতায়েন

www.pathagar.com

রাখা প্রজাদের উপর কর আদায় করা ও জরিমানা ধার্য করা এবং নিজস্ব আদালত স্থাপন করে প্রজাদের বিচার করার স্বাধীনতা লাভ করত। এবং এ ধরনের কার্যসম্পাদনে লর্ড কখনই হস্তক্ষেপ করতেন না। লর্ডের কাছ থেকে প্রাপ্ত জমি ভ্যাসাল আমৃত্যু ভোগ করতে পারতেন। শুধু মাত্র সামন্তপ্রভুর কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা দেখালেই এ জমি থেকে ভ্যাসাল বঞ্চিত হতে পারত। ভ্যাসাল এর মৃত্যুর পর জমি পুনরায় সামন্তপ্রভু ফিরে পেতেন। এবং ইচ্ছা করলে সামন্ত প্রভুর সে জমি পূর্বতন ভ্যাসাল-এর ছেলেকে বা অন্য কাউকে দিয়ে দিতেন। সামন্ত ব্যবস্থায় রাজার ক্ষমতাই ছিল সবচেয়ে কম। রাজার নিজস্ব কোন সৈন্য ছিল না। রাজার প্রত্যক্ষ ভ্যাসালগণই রাজাকে সৈন্য সরবরাহ করতেন। শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত ব্যাপারে একমাত্র প্রত্যক্ষ ভ্যাসাল ছাড়া আর কারও উপর রাজার কোন ক্ষমতা ছিল না। এই ভ্যাসালগণ রাজাকে কর দিতেন। এ ছাড়া রাজ্যের অন্য প্রজাদের উপরও রাজার কর আরোপের ক্ষমতা ছিল না। মধ্যযুগের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোন সাধারণ প্রজার পক্ষে রাজার কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। উপরন্তু শার্লামেনের মৃত্যুর পরে দুর্বল ফ্রাঙ্ক রাজাদের ক্ষমতা ছিল না সামন্ত প্রভুদের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করা। কাজেই সব ব্যাপারে সামন্ত প্রভুগণ ছিলেন স্বাধীন এবং এদের হাতের পুতুল হয়েই রাজাকে চলতে হত।

রাজা থেকে শুরু করে নাইট পর্যন্ত সকল সামন্তপ্রভুই একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। এরা ছিল শাসক ও শোষক শ্রেণী। এদের বিপরীত দিকে ছিল একদল বিত্তহীন কৃষককুল, সামন্তপ্রভুর জমিতে চিরকালের জন্য বাঁধা। এদের বলা হত সার্ফ বা ভূমিদাস।

প্রত্যেক সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ ভূখণ্ড কতকগুলি ম্যানরে বিভক্ত থাকত। ম্যানরের কোন নির্দিষ্ট আকার ছিল না। তবে কোন ম্যানরই ৩০০ থেকে ৪০০ একরের কম হত না। প্রত্যেকটি ম্যানর ছিল এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কৃষিকার্য থেকে শুরু করে মানুষের জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য সকল প্রকার পণ্য উৎপাদন কার্য এখানে সম্পন্ন হত।

ম্যানরের একদিকে থাকত সামন্তপ্রভুর দুর্গ ও দুর্গ সংলগ্ন আবাদযোগ্য সর্বোৎকৃষ্ট জমি; কিছুদূরে থাকত চার্চ ও চার্চ সংলগ্ন আবাদ জমি, বনভূমি ও চারণভূমি (যার উপর জমিদারের দখলই ছিল সর্বাধিক); এবং সম্মানজনক দূরত্বে থাকত কৃষকদের বাসগৃহ ও চাষের জমি।

www.pathagar.com

সমগ্র আবাদযোগ্য ভূমিকে চাষাবাদের সুবিধার্থে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হত: (ক) বসন্তকালীন আবাদভূমি, (খ) শরৎকালীন আবাদ ভূমি ও (গ) পতিত ভূমি। এই ভূমি খণ্ডগুলিকে প্রতি বৎসর অদলবদল করে চাষ করা হত, যেমন: এক বছরের বসন্তকালীন আবাদভূমি পর বছর শরৎ-কালে চাষ করা হত, শরৎকালের আবাদ ভূমি পতিত রাখা হত উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ও পতিত ভূমিকে বসন্তকালে আবাদ করা হত। পর বছর আবার অন্যভাবে ভূমি আবাদ করা হত। এভাবে প্রতি বছর এক এক ঋতুতে এক এক ভাগ জমি চাষ করার ফলে জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেড়ে যেত। সামন্ত যুগের এ আবাদ পদ্ধতিকে বলা হত ত্রিধা ব্যবস্থা।

সামন্ত প্রথায় উৎপাদনের কাজে সামন্ত প্রভুদের কোন ভূমিকা ছিল না। উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত ছিল কেবল কৃষকগণ, আর জমির মালিক ছিল জমিদার, এবং উৎপন্ন ফসলের বিরাট অংশ তারাই পেত।

জমিদার ও তাদের পরিবার ও আশ্রিতবর্গ, চার্চের যাজক সম্প্রদায়, ম্যানরের কর্মচারীবৃন্দ, মঠের সন্ন্যাসীদল, ক্ষুদ্র উৎপাদক ও হস্তশিল্পীবৃন্দ প্রভৃতিদের বাদ দিলে এই কৃষকদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। কৃষকদের মোটামুটি চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হত: ভিলেন, সার্ফ, ক্রফটার ও কটার।

প্রথমে অবশ্য ভিলেন ও সার্ফদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও পরবর্তীকালে এই পার্থক্য লোপ পায়। প্রথমদিকে ভিলেনরা ছিল ক্ষুদ্র কৃষক যারা অবস্থার দুর্বিপাকে নিজেদের ভূমিখণ্ডটুকু অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকের হাতে সমর্পণ করে তার আজ্ঞাবহ কৃষকে পরিণত হয়। সার্ফদের পূর্ব পুরুষগণ পুরো গ্রাম সমেত কোন ধনী সামন্তপ্রভুর দখলে চলে যায়, ভিলেনগণ ছিল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, জমির সাথে চিরকাল বাঁধা তারা ছিল না। কিন্তু এক একটি ম্যানর প্রভুর হাত বদলের সাথে সাথে সার্ফরাও জমি সমেত নতুন প্রভুর হাতে গিয়ে পড়ত। জমি ছেড়ে তাদের চলে যাওয়ার কোন অধিকার ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ভিলেন ও সার্ফদের এই পার্থক্য দূরীভূত হয় এবং তারা মোটামুটি একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তখন তারা বিভিন্ন প্রকার খাজনার বিনিময়ে জমির উপর সীমিত ধরনের মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।

ক্রফটার ও বোর্ডার বা কটারগণের ছিল আরও হীনাবস্থা। তাদের নিজস্ব কোন জমি ছিল না। ভূমিহীন এ সমস্ত কৃষক প্রভুর কাছ থেকে একখণ্ড জমি নিয়ে তার বিনিময়ে প্রভুর জমিতে বেগার খাটত।

www.pathagar.com

এভাবে একশ্রেণীর লোক সামন্তপ্রভুর ভূমিদাসে পরিণত হয়ে প্রভুর সেবায় তার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করল। বিনিময়ে প্রভু তাকে এটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি কৃষকদের সকল রকম বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং তাকে তার জমি থেকে কখনই বঞ্চিত করবেন না।

সামন্ত প্রথার উৎপত্তির কারণ ঃ

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ব্যাপী যে অরাজকতা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে প্রধান অভাব দেখা দিল নিরাপত্তার। রোমের কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙ্গে পড়ছিল, দাস মালিকদের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ দাসদের বিদ্রোহ, সরকারী কর্মচারীদের উৎপীড়নে নাগরিকদের পলায়ন এবং সর্বোপরি বর্বরদের আক্রমণ—এসবের প্রেক্ষিতে জনজীবনে যে ভীষণ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তাতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে জনগণ এমন কোন ব্যক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করছিল যে তাকে অন্তত কিছুটা নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও স্বাধীন কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক সকলেই আশ্রয় ছিল নিকটবর্তী কোন বৃহৎ ভূস্বামীর নিকট যে তার নিজস্ব শক্তির সাহায্যে তাকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম।

অন্যদিকে সর্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তাতে প্রাচীন যুগের দাস প্রথা অচল হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন কৃষি কিংবা শহরে কারখানা, কোথাও এ প্রথা আর লাভজনক ছিল না, সাধারণভাবে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ব্যাপকহারে উৎপাদিত পণ্যের বাজারই লোপ পেয়েছিল।

এই আর্থিক অরাজকতার দিনে কৃষির পুনর্বিন্যাস ছাড়া ভূস্বামীদের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ার ফলে বড় বড় লাটিফাণ্ডিয়া বা কৃষিখামারে শস্য উৎপাদন আর লাভজনক থাকে না। এ অবস্থায় বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাসের ভরণপোষণ ভূস্বামীদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ফলে লাটিফাণ্ডিয়াগুলো ভেঙ্গে সেখানে ছোট ছোট জমিতে প্রজা বসানো শুরু হয়। করভার এড়াবার জন্য ভূস্বামীরা গ্রামে চলে গিয়ে সুবিধা মত দুর্গ বা ভিলা তৈরী করে সেখানে থেকে কৃষি পরিচালনা করতে থাকে। শোষণের ধরনও তখন পাল্টে যায়। সাধারণ দাসশ্রমে কৃষিকার্য

www.pathagar.com

না চালিয়ে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলে ভাগ বসানো তাদের কাছে অধিক লাভজনক মনে হয়।

এ সময়ে দু ধরনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রথম ব্যবস্থায় স্বাধীন ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ নিজের ভূমিখণ্ডটুকু ভূস্বামীকে দিয়ে তার আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে এবং পরে ভূস্বামী তাকে সেই ভূখণ্ডটি চাষাবাদের জন্য ব্যবহার করতে দেয়। এক্ষেত্রে জমিতে উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষক ভূস্বামীকে দিতে স্বীকৃত হয়। জমি ভোগ ও ব্যবহার করার অনুমতি পেলেও জমির মালিকানা থাকে ভূস্বামীর হাতে এবং ভূস্বামী ইচ্ছা করলে কৃষককে যে কোন সময়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। এ ধরনের ভূমি ব্যবস্থাকে বলা হত প্রিকেরিয়াম (Precarium) প্রথা। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে এসব কৃষকরা ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীন থাকলেও জমির সাথে আটকা পড়ে এবং এ অবস্থা তাদের বংশধরদের মধ্যে পর্যবসিত হয়। ক্রমে সমস্ত চাষীরাই এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ ধরনের চাষীরাই পরবর্তীকালে ভিলেন ও সার্ফে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় প্রথার নাম ছিল প্যাট্রোসিনিয়াম (Patrocinium) প্রথা। ভূমিহীন কৃষক, বেকার শ্রমিক সদ্যমুক্ত বা পলাতক ক্রীতদাস কোন ভূস্বামীর নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। এক্ষেত্রে ভূস্বামী তাকে একখণ্ড ছোট বাগান বা একটুকরো জমি চাষের জন্য দিয়ে দেয়। বিনিময়ে ভূস্বামীর জমিতে সপ্তাহের কয়েকদিন বেগার খাটতে হত। এ ধরনের কৃষকগণই পরবর্তীকালে কটার বা বোর্ডারে পরিণত হয়।

এভাবে সকল কৃষকই স্বাধীনতা হারিয়ে জমিদারের ভূমিদাসে পরিণত হল বটে, কিন্তু তবু তারা এক ধরনের নিরাপত্তা লাভ করল যা রোমান ক্রীত-দাসগণ কখনও পায়নি। ক্রীতদাসদের মত ভূমিদাসদের তাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত না। এবং সর্বোপরি তাদের জমি থেকে বঞ্চিত করা যেত না। ক্রীতদাসদের থেকে তাদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটেছিল এই কারণে যে তারা অন্ততঃ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারত এবং যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন একখণ্ড জমি ও একটি কুঁড়ে ঘর চাষ করার ও বাসের জন্য লাভ করত।

উপরোক্ত ভিলাগুলিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে মৌজা বা ম্যানর গড়ে ওঠে; ম্যানরগুলি ক্রমে স্বনির্ভর অর্থনীতির দিকে মোড় নেয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী

www.pathagar.com

থেকেই প্রতিটি ম্যানরে কামার, কুমার, তাঁতী, ছুতোর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগর প্রতিপালিত হতে থাকে। এভাবে মুদ্রা নির্ভর নগরভিত্তিক অর্থনীতি ধ্বসে পড়ে এবং নবোপলীয় ধরনের স্বনির্ভর গ্রামীন অর্থনীতির উদয় হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা পশ্চাদগতি মনে হলেও এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। রোমান সভ্যতার পতনের ফলে দাস অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল কিন্তু নতুন উৎপাদন প্রথার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত গ্রামীণ জীবন যাত্রায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু লোহার ব্যাপক ব্যবহার (যা দাসযুগেও হয়নি) ও উন্নত ধরনের কৃৎকৌশলের সাহায্যে গড়ে ওঠা এ সামন্ততান্ত্রিক গ্রামগুলি নিঃসন্দেহে নবোপলীয় গ্রাম অপেক্ষা অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। জার্মানদের আগমন ইউরোপে সামন্তপ্রথার অভ্যুদয়ে একধাপ অগ্রগতি সাধন করে।

সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যে একমাত্র ফ্রাঙ্কগণই মোটামুটিভাবে একটি স্থায়ী রাজ্য গঠনে সক্ষম হয়। ফ্রাঙ্করা যখন পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করে তখন প্রিকেরিয়াম ও প্যাট্রোসিনিয়াম প্রথা প্রচলিত ছিল। ইচ্ছা করলে ফ্রাঙ্কগণ এ ধরনের বেআইনী প্রথার অবসান ঘটাতে পারত। কিন্তু তা না করে বরং তারা নিজেরাই এ প্রথা গ্রহণ করে। কারণ ফ্রাঙ্কদের মধ্যে একই ধরনের প্রথা বিদ্যমান ছিল। এ ধরনের একটি প্রথার নাম ছিল কমিটেটাস (Comitatus), সেনাধ্যক্ষ ও তার অধীনস্থ সৈন্যদের মধ্যে যে ধরনের পারস্পরিক কর্তব্য ও আনুগত্যের সম্পর্ক থাকে কমিটেটাস সে ধরনেরই প্রথা; অতএব একই ধরনের প্রিকেরিয়াম ও প্যাট্রোসিনিয়াম পদ্ধতি গ্রহণে ফ্রাঙ্কদের কোন অসুবিধা ছিল না। বিজিত রাজ্যে বিরাট বিরাট ভূখণ্ড দখল করে তারা নিজেরাই এ প্রথাগুলোর অনুসরণে বিপুল সংখ্যক কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করে।

ক্লভিসের মৃত্যুর পর যখন মেরোভিঞ্জিয়ান রাজ্য তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের হাতে গিয়ে পড়ে, তখনই সামন্তপ্রথার দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়ে থাকে। দুর্বল ও অকর্মণ্য মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের সাধ্য ছিল না একটি সক্ষম কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সেক্ষেত্রে নিজ নিজ এলাকার সামন্তপ্রভুরাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। এমনকি চার্চগুলি পর্যন্ত এক একটি বিরাট সামন্তপ্রভুতে পরিণত হয়। চার্চ ও মঠগুলির কর্মাধ্যক্ষগণ জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জমি প্রাপ্ত হন আবার তাদেরকে সে জমিরই ভূমিদাসে

www.pathagar.com

পরিণত করেন। এভাবে প্রতিটি চার্চ ও মঠ বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়।

সামন্তপ্রথা এভাবে ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। সাথে সাথে তার প্রকৃতিগত পরিবর্তনও চলতে থাকে। রোমান প্যাট্রোসিনিয়াম ও প্রিকেরিয়াম প্রথার সাথে জার্মান কমিটেটাস প্রথাও যুক্ত হয়। কমিটেটাস প্রথা থেকেই উৎপত্তি হয় সামন্ত প্রথার লর্ড ও ভ্যাসাল-এর সম্পর্ক। সামন্ত প্রথার যে 'হোমেজ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভ্যাসাল তার সামন্তপ্রভুর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিও কমিটেটাস প্রথা হতে উদ্ভূত।

শুধু সামরিক কর্তব্যের সম্পর্কই তখনও গড়ে ওঠে নি। এটা গড়ে ওঠে যখন অষ্টম শতাব্দীতে স্যারাসিন বা মুসলিমগণ ফ্রাঙ্ক্য রাজ্য আক্রমণ করে। স্পেনের মুসলমানগণ তাদের সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের নেতৃত্বে যখন পীরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে গলে প্রবেশ করে তখন অশ্বারোহী মুসলিম সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার মত শক্তি পদাতিক ফ্রাঙ্ক সৈন্যদের ছিল না। অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার মত অর্থও ফ্রাঙ্ক রাজাদের ছিল না কারণ, দুর্নীতিপরায়ণ মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের হাতে রাজকোষ পূর্বেই শূন্য হয়ে যায়। তখন মেরোভিঞ্জিয়ান রাজ্যের প্যালেসের মেয়র চার্লস মার্টেল রাজার আদেশে চার্চসংলগ্ন বিরাট ভূখণ্ডগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেন। এগুলি সঙ্গে সঙ্গে এমন সব অনুগত ভূস্বামীদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয় যারা রাজাকে অশ্বারোহী, অস্ত্র ও বর্মসজ্জিত সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। সামন্ত-প্রভুদের দ্বারা সংগৃহীত এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে চার্লস মার্টেল মুসলিমদের ফ্রাঙ্ক রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। এর পর থেকেই লর্ডকে সৈন্য সাহায্য করা ভ্যাসাল-এর একটি অবশ্য কর্তব্যরূপে পরিগণিত হয় এবং সামরিক দায়িত্ব পালন সামন্তপ্রথার একটি বিশেষ অঙ্গরূপে গড়ে ওঠে।

ক্যারোলিঞ্জিয়ানদের সময়ে সামন্তপ্রথা পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও শার্লামেনের অসামান্য প্রভাব ও অপরিসীম ক্ষমতার বলে একটি কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য সমগ্র ইউরোপে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তা ভেঙে পড়ে। শার্লামেনের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে স্থানীয় ডিউক, কাউন্ট বা মারগ্রেভগণ (যাঁরা ছিলেন শার্লামেনের নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী) প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের

www.pathagar.com

প্রতি বিন্দুমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন না করে স্বাধীন সামন্তপ্রভুর ন্যায় আচরণ শুরু করেন। ঠিক এ সময়েই শুরু হয় ব্যাপক বৈদেশিক আক্রমণ। স্লাভ, অ্যাভার, হাঙ্গেরিয়ান ম্যাগায়ার, সারাসিন ও সর্বোপরি নর্ম্যানদের আক্রমণের মুখে সামন্তপ্রথাই ইউরোপের একমাত্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা রূপে গড়ে ওঠে।

সামন্ত যুগে কৃষকদের অবস্থা ঃ

সামন্তযুগের সকল কৃষকদের মোটামুটি একটি নামে অভিহিত করা চলে--সার্ফ বা ভূমিদাস। এরাই ছিল সমাজের মূল উৎপাদকশ্রেণী। অভিজাত সামন্ত আর যাজক-সম্প্রদায় টিকে ছিল এদের শোষণ করে। প্রথম দিকে প্রজাপালন এবং অপরাপর যে সকল জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব সামন্ত রাজারা পালন করতেন পরবর্তীকালে তা লোপ পায় এবং প্রজাপীড়ন অবিরতই বাড়তে থাকে। সামন্তযুগের শেষের দিকে এ অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। চাষীকে মনে করা হত লাভের উপকরণ পশুবিশেষ, তা সে যার প্রজাই হোক না কেন—রাজার বা সামন্তের অথবা যাজকের।

কৃষকদের উপর নানা ধরনের ট্যাক্স বা কর বসানো হত।

প্রথম ধরনের ট্যাক্সের নাম ক্যাপিট্যাশিও (Capitatio), সার্ফের পরিবারের প্রত্যেক লোকের উপর মাথাপিছু এই ট্যাক্স বসান হত।

চাষীর জমির উৎপন্ন ফসলের একটি বিরাট অংশ জমিদারকে দিতে হয়। এর নাম টেইলি (taille) বা মেটায়েজ (Metayage)। শুধু ফসলই নয়, খামারের হাঁস-মুরগী, ডিম, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ ও মাংস প্রভৃতির অংশও ছিল জমিদারে প্রাপ্য।

কৃষকের জমিতে উৎপাদিত গম বা আঙ্গুর জমিদারের কলে পেশা হত, কারণ গম ভাঙার কল বা আঙ্গুর পেশার মেশিন জমিদারেরই ছিল। কাজেই এর একটা অংশ ছিল জমিদারের প্রাপ্য। ম্যানরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোনো নদী বা খাল এবং রাস্তার উপর ছিল জমিদারেরই অধিকার; অতএব ফসল নিয়ে এগুলো পার হতে গেলে ফসলের কিছু অংশ জমিদারের পেয়াদা নিয়ে যেত। হাটে গিয়ে ফসল বিক্রী করতে গেলে সেখানেও জমিদারের পেয়াদাকে খাজনা দিতে হত। এ ধরনের ট্যাক্সকে বলা হত বেনালাইটিস (benalites)।

www.pathagar.com

চাষীর ফসল ঘরে ওঠার সময়ে জমিদার তার দলবল নিয়ে এক ম্যানর থেকে আর এক ম্যানরে খাজনা আদায়ে বের হতেন। তখন কৃষকের বাড়তে অববস্থান করার সময়ে জমিদার ও তার লোকজনকে জমিদারী কায়দায় আপ্যায়ন করার ভার থাকত কৃষকের উপর। জমিদারের ঘোড়া ও কুকুরদেরও আপ্যায়ন করতে হত। এ ধরনের ট্যাক্সকে বলা হত প্রেসটেশন (Prestations)।

এ ছাড়া সপ্তাহে তিন অথবা চারদিন চাষীকে জমিদারের জমিতে বিনা-মজুরীতে কাজ করতে হত। শুধু ক্ষেতের কাজই নয়; রাস্তা বানানো, পুল তৈরী বা মেরামত ইত্যাদি যে কোনো কাজে জমিদার তলব করলেই চাষী বেগার খাটতে বাধ্য থাকত। এ ধরনের বেগার খাটাকে বলা হত কর্ভি (corvee)। জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে অধিকাংশ সময়েই চাষী নিজের ক্ষেতের কাজ ঠিকমত করতে পারত না। বীজ বপনের সময়ে বা ফসল তোলার সময়ে কৃষকরা জমিদারের কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে অধিকাংশ সময়েই চাষীর নিজের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হত। কিন্তু ফসল ফলুক বা না ফলুক জমিদারের খাজনার হাত থেকে কৃষকের রেহাই নেই। জমিদার ছাড়া চার্চকেও এক প্রকার কর দিতে হত প্রজাদের। এর নাম ছিল টাইথ (tithe)। চার্চগুলিও প্রচুর ভূ সম্পত্তির মালিক ছিল। চার্চের ধর্মযাজক ও জমিদার উভয়ে মিলেই কৃষককে শোষণ করত।

সামন্তপ্রভুর মেয়ের বিবাহে বা জ্যেষ্ঠপুত্রের নাইট উপাধিতে দীক্ষিত হওয়া উপলক্ষেও প্রজারা জমিদারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকত। জমিদারের অনুমতি ছাড়া কৃষক তার কন্যার বা পুত্রের বিবাহ দিতে পারত না। এ উপলক্ষে চাষীর জমিদারকে খাজনা দিতে হত। এ ছাড়া পথকর, যুদ্ধকর এবং অন্যান্য স্থানীয় ও রাজকীয় কর তাকে শুধতে হত। হিসাব করে দেখা গেছে জমিদারের অত্যাচার বাড়তে বাড়তে এমন স্তরে পেঁৗছেছিল যে কৃষককে তার রোজগারের শতকরা আশী ভাগেরও বেশী খাজনা ও অন্যান্য আকারে সামন্ত প্রভুদের দিতে হত। প্রভুর খাই না মিটিয়ে সে মরতেও পারত না। আবার মরলেও রেহাই নেই। বাড়ীর সবচেয়ে ভাল গরু বা মহিষটা জমিদারকে দেওয়ার পরই মৃতদেহ সৎকার করা যেত।

এ সকল কর ঠিকমতো প্রদান করতে না পারলে চুনের গুদামে চাষীকে

www.pathagar.com

কয়েদ করে রাখা, বেত্রাঘাত করা বা দরকার হলে গর্দান কেটে ফেলা ছিল সাধারণ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।

বিধি-বহির্ভূত অনেক কাজই চাষীকে করতে হত, যেমন জমিদারের জন্য কাঠ কাটা, খড় কুড়ানো, ফল পাড়া, শামুকের খোলা সংগ্রহ, ইত্যাদি। মাছ ধরা, শিকার করার অধিকার ছিল প্রভুর। শিকার ধাওয়া করে নিয়ে যেতে হত বেগারখাটা কৃষকদের। শিকারের সময়ে নিজেদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট হলেও কৃষককে মুখ বুজে থাকতে হত। কৃষকের জমিজমা ও সম্পত্তি ছাড়া স্ত্রী-কন্যার ওপরও জমিদারের অধিকার ছিল। কৃষকের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যার সন্ধান পেলেই জমিদারের লালসার হস্ত সেখানেও গিয়ে পৌঁছাত। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই কৃষকের ছিল না। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া এবং সেই অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। সামন্তযুগে ইউরোপে কৃষকের এই ছিল সাধারণ অবস্থা।

এ সকল অসহায় কৃষকদের সম্পর্কে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট-এর উক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

> "The serf serves; he is terrified with threats, weaned by corvees (forced services), afflicted with blows, despoiled of his possessions; for, if he possesses nought he is compelled to earn; and if he possesses anything he is compelled to have it not; the lord's fault is the serf's punishment; the serf's fault is the lord's excuse for preying on him..... O extreme condition of bondage ! Nature brought freemen to birth, but fortune hath made bondmen. The serf must needs suffer, and no man is suffered to feel for him, he is compelled to mourn, and no man is permitted to mourn with him. He is not his own man, but no man is his !"

"ভূমিদাস কেবল সেবা করে; তাকে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রস্ত রাখা হয়, জবরদস্তি শ্রম কর্ভি দ্বারা বিব্রত করা হয়, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হয়, তার সম্পদ হরণ করা হয়; কারণ, যদি তার সম্পদ না থাকে তবে তা অর্জন করতে তাকে বাধ্য করা হয়; আর যদি তার কোনো সম্পদ থাকে

www.pathagar.com

তবে তা থেকে বঞ্চিত হতে তাকে বাধ্য করা হয়; জমিদারের দোষে ভূমিদাস শাস্তি পায়; ভূমিদাসের দোষ ঘটলে তা অত্যাচারের অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়···। হায়, পরাধীনতা কি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। প্রকৃতি সৃষ্টি করে স্বাধীন মানুষের কিন্তু ভাগ্যদোষে সে পরাধীন হয়। ভূমিদাস কষ্ট পেতে বাধ্য হয় কিন্তু তার জন্যে কেউ কষ্ট পায় না; ভূমিদাস দুঃখ পেতে বাধ্য হয় কিন্তু তার জন্যে কেউ দুঃখ করতে পারে না। তার আপন বলতে কেউ নেই, সে নিজেও তার আপন লোক না!"

সার্ফদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিও ছিল অতি নিম্নস্তরের। ক্ষুদ্র কুঁড়েঘরে (অধিকাংশই কাঠের তৈরী) অন্ধকার নোংরা, স্যাঁতসেঁতে, ধূমযুক্ত কক্ষে তারা অতি দীনহীনভাবে জীবনযাপন করত। ঘরগুলিতে জানালা বলতে কিছু ছিল না। ছাদের মধ্যে একটি ছোট চিমনীর সাহায্যে ধোঁয়া নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও ঘর অধিকাংশ সময়েই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। তাছাড়া অনেকগুলি লোক একই ঘরে থাকার ফলে তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস সর্বদাই কলুষিত থাকত। আসবাবপত্রের মধ্যে দু একটি কাঠের টুল ছাড়া আর কিছু ছিল না। অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার দু একজন কৃষকের বাড়ীতে এক-আধখানা চৌকি বা তক্তপোষ থাকলেও অধিকাংশই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুধু খড় বিছিয়ে রাত্রিযাপন করত।

শীতপ্রধান দেশ হলেও ইউরোপের অধিকাংশ চাষীরই গরম কাপড় জুটত না; শত তালি দেয়া একটি কোট, টুপি বা প্যান্ট জোগাড় হলেও জুতো সংগ্রহ করা বেশীরভাগ কৃষকের পক্ষেই অসম্ভব ছিল।

আহারের উপকরণও ছিল খুবই সামান্য। ফসল ঘরে ওঠার পর দুতিন মাস পর্যন্ত কিছু আহার জুটলেও বছরের বাকী ক'টা মাস একটু শুকনো রুটি ও নুন অনেক কৃষকেরই জুটত না। ফসল নষ্ট হলে তো অনাহার ও অর্ধাহারই ছিল নিত্য সাথী। এ ছাড়া ছিল ঝড়, বন্যা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। এ সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও সামন্তযুগের কৃষকসমাজ অর্থনীতিকে চালু রেখেছে।

নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু, সমাজের উচ্চতলার বাসিন্দাদের দ্বারা শোষিত এবং তাদের কাছে হেয়, ঘৃণিত ও অবজ্ঞার পাত্র হয়েও এ কৃষকরাই বছরের পর বছর ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছে, কাপড় ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি শুধু সামন্ত প্রভুই নয়, সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে।

www.pathagar.com

সামন্ত-প্রভুদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি

সামন্ত প্রভুদের সমাজ ছিল অভিজাত। সামন্ত প্রভুর পুত্র বা পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কেউ এ সমাজে প্রবেশ করতে পারত না। একমাত্র রাজা কারও উপর সন্তুষ্ট হয়ে জমি বা পদ না দিলে কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে এ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছিল অসম্ভব। প্রতিটি সামন্ত প্রভুর আভিজাত্য নির্ণীত হত তার পদমর্যাদা, ভূমির পরিমাণ, গবাদি পশু এবং সার্ফ ও সৈন্যের সংখ্যা দ্বারা। নিজের আভিজাত্যবোধ সম্বন্ধে প্রতিটি সামন্তপ্রভুই ছিল অত্যন্ত সচেতন এবং নিজের লর্ড ব্যতীত আর কারও কাছে কেউ আনুগত্য প্রদর্শন করত না, এমনকি রাজাকেও না। প্রতিটি সামন্ত প্রভুর লক্ষ্য ছিল নিজের জমির পরিমাণ ও সার্ফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা কারণ এতেই তার সম্পদ বৃদ্ধি হবে। ফলে পার্শ্ববর্তী বা নিকটস্থ সামন্ত প্রভুর সাথে কলহ এবং শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ছিল সাধারণ ঘটনা। প্রতিটি সামন্ত প্রভুই নিজ ধন ও সম্পত্তি রক্ষা ও বর্ধনে এত ব্যগ্র থাকত যে, অবশ্যম্ভাবী রূপে তারা পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ত। এই কলহ এত দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে যে মধ্যযুগের ইউরোপে একদিনের জন্যও শান্তি স্থাপিত হয়নি। সামন্ত জমিদারগণের পরস্পরের মধ্যে সম্ভবতঃ কখনই একতা স্থাপিত হয়নি, একমাত্র প্রজাপীড়ন ও কৃষকবিদ্রোহ দমনের কাজে ছাড়া। এমন কি বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখেও তারা কখনও একত্রিত হয়নি। শুধুমাত্র নিজ নিজ ভূখণ্ডটুকু রক্ষা করেই তারা নিশ্চিন্ত থাকত।

অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভুদের কোন ভূমিকা ছিল না। অতএব তাদের ছিল অখণ্ড অবসর। এই অবসর সময়ে তারা আমোদ-প্রমোদ, শিকার এবং যুদ্ধের কাজেই ব্যস্ত থাকত। প্রথম দিকে তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো প্রকার বিলাস দ্রব্যের আগমন ঘটে নি। কিন্তু ক্রুসেডের পরে প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের সম্পর্ক স্থাপনের ফলে বিলাস-সামগ্রীর আমদানীর পরে প্রতিটি সামন্ত প্রভুর আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্রে অতিমাত্রায় বিলাসিতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে।

প্রতিটি সামন্তপ্রভুর বাসগৃহই ছিল এক একটি দুর্গবিশেষ। বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রস্তর নির্মিত এ দুর্গগুলির অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে তৈরী করা হত। প্রথমদিকে এ সকল দুর্গগুলিতে বাসগৃহের স্বাচ্ছন্দ্য বা সুযোগ-সুবিধা বিশেষ ছিল না।

www.pathagar.com

ঘরগুলো ছিল অন্ধকার, শীতল ও স্যাঁতসেঁতে। আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল কয়েকটি ভারী চেয়ার, টেবিল ও খাট। একাদশ শতাব্দীর পরেই শুধু এ সকল কক্ষে কম্বল ও কার্পেটের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

সামন্ত প্রভুরা যদিও অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিল এবং দিনের অধিকাংশ সময়েই আহারে ব্যাপৃত থাকত, তবুও প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে মশলার আমদানী না হওয়া পর্যন্ত তাদের খাদ্যদ্রব্য বিশেষ সুস্বাদু ছিল না। পোষাক-পরিচ্ছদে ফ্যাসনের আবির্ভাব ঘটে শুধুমাত্র প্রাচ্যের বিলাসবস্তু আমদানীর পরেই। তাছাড়া সুগন্ধী ও অন্যান্য বিলাস দ্রব্যের সাথে তারা ক্রুসেডের পরেই পরিচিত হয়। এ সমস্ত বিলাস সামগ্রী কেনার প্রয়োজনে তারা কৃষকদের উপর খাজনার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয় এবং সামন্ত প্রভুদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে গিয়ে কৃষককুল আরও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

সামন্ত প্রভুদের অখণ্ড অবসর কাটত খেলাধূলা, শিকার ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে। অসি চালনা তাদের একটি প্রিয় খেলা ছিল। অসি চালনা দুজনের মধ্যে সংঘটিত হলে বলা হত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা ডুয়েল এবং দুই দলের মধ্যে সংঘটিত হলে তাকে বলা হত টুর্ণামেন্ট। এ দুই প্রকারের খেলাই এক এক সময়ে মারাত্মক সংঘর্ষে রূপান্তরিত হত। যদিও খেলার ছলেই এটা শুরু হত তথাপি অনেক সময়ে তা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হত। কারণে অকারণে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সামন্ত প্রভুদের নিকট ছিল একটি বিলাসিতা; অস্ত্র ও লৌহ-বর্ম সজ্জিত, অশ্বারোহী নাইটগণ যেখানে সেখানে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত। ফলে সারা ইউরোপে এত বেশী রক্তপাত ঘটে যে শেষ পর্যন্ত চার্চকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

দশম শতাব্দীতে পীস অব গড (Peace of god) নামক চার্চের নির্দেশ দ্বারা ধর্মস্থান, ধর্মযাজক বা গরীব লোকের প্রতি আক্রমণকে অভি-সম্পাতের কারণ বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীদের উপর কোনো আক্রমণকেও চার্চ নিন্দা করে।

একাদশ শতাব্দীতে ট্রুস অব গড (Truce of god)-এর দ্বারা প্রতি সপ্তাহের বুধবার সূর্যাস্ত থেকে সোমবার সূর্যোদয় পর্যন্ত, এবং প্রতি বৎসরের বড়দিন (২৫শে ডিসেম্বর) থেকে এপিফ্যানীর (৬ই জানুয়ারী) উৎসব পর্যন্ত যুদ্ধকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া বসন্ত ঋতুর অধিকাংশ, গ্রীষ্মের শেষভাগ এবং শীতের প্রারম্ভেও যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বীজ

www.pathagar.com

বপন ও ফসল তোলার সময়টুকুতে অন্ততঃ কৃষককে রক্ষা করা। একাদশ শতাব্দীতে পোপ ক্রুসেডের ডাক দিলে সাময়িকভাবে সামন্ত প্রভুদেব এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

সামন্ত অর্থনীতির রূপ

সামন্ত যুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক, গ্রামীণ ও স্বনির্ভর। প্রতিটি ম্যানরই স্থানীয়ভাবে যা প্রয়োজন সবকিছুই উৎপন্ন করত ও ব্যবহার করত। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্যে কামার, কুমার, ধোপা, তাঁতী ছিল। বাইরের থেকে দরকারী জিনিস আমদানী করার রেওয়াজ ছিল না, উপায়ও বিশেষ ছিল না। যা স্থানীয় ম্যানরে পাওয়া যেত না—যেমন, লোহা ও লবণ—শুধু তাই বাইরে থেকে আনতে হত।

আপাতদৃষ্টিতে ইউরোপের সামন্ত সমাজ সংগঠন পূর্ববর্তী নবোপলীয় গ্রাম সংগঠনের অনুরূপ। কিন্তু ভুললে চলবে না যে লোহার ব্যাপক ব্যবহার এবং উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৌশলের প্রয়োগের সাহায্যে যে অর্থনীতি ইউরোপে উদিত হয়েছিল তা ছিল নবোপলীয় যুগের তুলনায় সহস্রগুণ সমৃদ্ধ। দাস-যুগে যে সকল যান্ত্রিক আবিষ্কার কেবল শহর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থেকে মুষ্টিমেয় অবসরভোগী শ্রেণীর সুখ বৃদ্ধির উপকরণ মাত্র হয়েছিল, সামন্তযুগে তা সারাদেশ-গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে সকল অঞ্চলেই উদ্বৃত্ত ফলন ও সম্পদের সৃষ্টি করেছিল। ব্যবসা বাণিজ্য বর্জিত সামন্তযুগে যে বিপুল সংখ্যক পরাশ্রয়ী অভিজাতশ্রেণীকে প্রতিপালন করা সম্ভব হয়েছিল শুধু তার থেকেই এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ বোঝা যাবে। উল্লেখযোগ্য যে সামন্ত অভিজাতশ্রেণী ও তাদের পোষ্যবর্গ সব মিলিয়ে ছিল সমগ্র জনসংখ্যার এক দশমাংশ। বস্তুত সামন্ত অর্থনীতি ছিল এমন কি ধনী শাসিত রোমান সভ্যতার চাইতেও শক্ত বুনিয়াদের।

তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে সামন্তযুগে ইউরোপে কৃষির উৎপাদন ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের। প্রথমদিকে কর্ষণযোগ্য জমির অধিকাংশই অনাবাদী পড়ে থাকত কারণ, জমিতে সার প্রদানের কোনো ভাল ব্যবস্থা ছিল না। উপরন্তু কয়েকবার চাষ করার পর জমির উৎপাদনক্ষমতা কমে গেলে জমি ফেলে রাখা হত। এর ফলে মোট জমির প্রায় তিন চতুর্থাংশই পতিত থাকত। 'ত্রিধা' ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ার পর অবশ্য কিছু কিছু জমিতে

www.pathagar.com

আবার আবাদ শুরু হয়। একাদশ শতাব্দীতে নতুন ধরনের ঘোড়ার সাজ এবং লোহার ক্ষুর প্রবর্তিত হওয়ায় ঘোড়ার কার্যক্ষমতা আগের তুলনায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। এর আগে যে রাশ ব্যবহার করা হত তাতে ঘোড়ার বুকে টান পড়ার ফলে তার বোঝা টানার ক্ষমতা হ্রাস পেত। নতুন ধরনের লাগাম ব্যবহারের ফলে ষাঁড়ের বদলে ঘোড়ায় টানা লাঙলের প্রচলন সম্ভব হল এবং লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি চাষের নতুন পথ খুলে গেল।

সামন্তযুগের স্বনির্ভর অর্থনীতি এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ম্যানরে বিভক্ত সামন্ততন্ত্রের পক্ষে নিজ উদ্যোগে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব ছিল না এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় সে শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রীভবনের সুযোগও সামন্ততন্ত্রে ছিল না। নবোপলীয় যুগের মতো সামন্তযুগেও তাই বিকাশের একমাত্র পথ ছিল নতুন নতুন আবাদ গড়ে তোলা এবং সামন্ততন্ত্রের শেষ কয়েক শ' বছর ইউরোপের পতিত অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া সামন্ত উৎপাদন প্রথায় আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। বস্তুত এই ভূমিগত সম্প্রসারণই ছিল একমাত্র পথ যার মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র নিজস্ব চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও বিকাশ লাভ করতে পারত। এ প্রচেষ্টায় সামন্ত প্রভু এবং যাজক-ভূস্বামী সকলেই ব্রতী হয়েছিল কারণ নিজেদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং জমিদারী বৃদ্ধিতে সকলেরই সমান উৎসাহ ছিল। নতুন আবাদে সুবিধাজনক শর্তে জমি আদায় করার সম্ভাবনা থাকায় ভূমিদাসেরাও এ সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়েছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এক ছটাক জমিও আর অনাবাদী রইল না। সামন্ততন্ত্রের প্রসারের পথও গেল রুদ্ধ হয়ে। এর ফলে যে আভ্যন্তরীণ সঙ্কট শুরু হল তার হাত থেকে সামন্ততন্ত্রের আত্মরক্ষা কোনক্রমে সম্ভব হল না।

সামন্ত প্রথায় চার্চের ভূমিকা

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক রূপরেখার পরিচয় পাওয়া যায় সামন্তপ্রথার মাধ্যমে। এর দার্শনিক ও ভাবাদর্শের রূপ পরিস্ফুট হয়েছে চার্চের মধ্য দিয়ে। বস্তুত সামন্তপ্রথার ভাবাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল চার্চ। অবশ্য চার্চ সামন্তপ্রথার বাইরে থেকে এ কাজ করেনি। চার্চ সামন্তপ্রথার মধ্যেই ঢুকে

www.pathagar.com

পড়েছিল। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি ছোট বড় চার্চই ছিল এক একটি সামন্ত-প্রভু। বহু জমি ছিল চার্চের অধীনে। মধ্যযুগের প্রথম দিকের নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন দিনগুলিতে লোকে আশ্রয়স্থল রূপে চার্চকেই জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তি দান করেছে। এ ছাড়া রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মীয় কাজ হিসাবে চার্চকে বহু জমি দান করেছেন। সে দিক দিয়ে বিচার করলে সমগ্র ক্যাথলিক জগতের এক তৃতীয়াংশ জমির মালিক ছিল চার্চ। এ সকল জমিতে ভূমিদাসদের বসিয়ে চার্চ তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে কর আদায় করত। সামন্ত প্রভুকে যে সকল কর ভূমিদাসরা দিত সেগুলো ছাড়াও টাইথ (tithe) নামক এক বিশেষ ধরনের কর চার্চ সকলের কাছ থেকে আদায় করত। কিন্তু প্রজা শোষণ বা সম্পত্তির আয় নিয়েই চার্চ তৃপ্ত ছিল না। সামন্তপ্রথা যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং এ প্রথার বিরোধী হওয়া যে ঈশ্বর বিরোধিতারই নামান্তর মাত্র—সেটা প্রচার করাই ছিল চার্চের সর্বপ্রধান কর্তব্য। সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তি রক্ষাই ছিল চার্চের দায়িত্ব। খৃষ্টধর্ম প্রাথমিকভাবে দারিদ্র্যের ধর্মরূপে আবির্ভূত হলেও পরে অবশ্য ধনবানদের স্বার্থরক্ষাই এর প্রধান কাজে পরিণত হয়। প্যাপাসির (পোপতন্ত্রের) উৎপত্তি, চার্চ সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি, এর ক্রম-বর্ধমান প্রভাব ও প্রসার প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত খৃষ্টধর্মকে ধনীর ধনরক্ষার হাতিয়ারেই পরিণত করে। দরিদ্রকে শোষণ ও সেইসঙ্গে শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে টিকিয়ে রাখার অপরিসীম প্রয়াসে তাকে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

মানুষের প্রতি মধ্যযুগীয় চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল রোমান সাম্রাজ্যের পতনের তমসাচ্ছন্ন যুগে। ক্যাথলিক চার্চ মানুষকে বোঝাত যে পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের প্রস্তুতি মাত্র। ইহকালে দুঃখভোগ করলে, দুঃখ-কষ্ট নীরবে সয়ে গেলে পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভ ঘটবে নিশ্চয়। তা না হলে অদৃষ্টে আছে অনন্ত নরকভোগ। চার্চ এভাবে কৃচ্ছ্র সাধনার শিক্ষা দিয়ে, ধৈর্য ও তিতিক্ষার বাণী প্রচার করে চেষ্টা করেছে জনসাধারণকে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিরত করতে। বস্তুত সামন্তপ্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য চার্চের প্রয়াস ছিল অপরিসীম।

চার্চ সংগঠনও মোটামুটি সামন্ত সংগঠনের অনুরূপই ছিল। সম্রাট, রাজা, ব্যারন, কাউন্ট, ভাই কাউণ্ট ইত্যাদির মত পোপের নীচে ছিলেন আর্চবিশপ, তারপরে বিশপ ইত্যাদি। পৃথিবীর মতো স্বর্গলোকেও ছিলেন নয় স্তরের দেবতা : সেরাফিম, চেরাবিম, থ্রোন; ডোমিনেশন, ভার্চু, পাওয়ার;

www.pathagar.com

প্রিন্সিপালিটি, আর্চ এঞ্জেল, এঞ্জেল। জগৎ পরিচালনায় এঁদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন।

চার্চের সুশৃঙ্খল কার্যধারা সামন্ত-রাজাদের উচ্ছৃঙ্খল ঝোঁক দূর করে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতে এক সর্বজনগ্রাহ্য কর্তৃত্বের সৃষ্টি করে। যাজকতন্ত্রের সাথে অবশ্য সামন্ত প্রভুদের মাঝে মাঝে বিবাদ দেখা দিত; কিন্তু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা অটুট রাখতে যে দুয়েরই প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে উভয় পক্ষই সচেতন ছিল।

সম্রাট ও পোপের সংঘর্ষ

মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল চার্চ। শুধু তাই নয়, চার্চ নিজেই সামন্তপ্রথার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। খৃস্টান চার্চ ও যাজকসম্প্রদায়ের হাতে সমগ্র ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড চলে গিয়েছিল। চার্চ ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামন্ত মালিক। চার্চের সংগঠনের রূপ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। চার্চের শ্রেণীবিন্যাস—পোপ, বিশপ, আর্চবিশপ প্রভৃতি ছিল সামন্তশ্রেণী বিন্যাসের অনুরূপ। সামন্তপ্রথার সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে চার্চের উপর সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য বহাল হয়। দশম একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের সমগ্র চার্চ এমনকি রোমের চার্চের উপর পর্যন্ত হোলি রোমান এম্পায়ার, দেশীয় রাজা বা সামন্ত-জমিদারদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমের পোপের নিযুক্তি হত কখনও কখনও ইতালীর বড় বড় সামন্ত জমিদারদের দ্বারা; এরা খেয়াল-খুশিমতো নিজেদের পছন্দমতো লোককে পোপ নিযুক্ত করতেন। ম্যারোজিয়া নামে একজন রোমান মহিলা এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে ৯২৮ খৃস্টাব্দে তিনি নিজের অবৈধ সন্তানকে রোমের পোপ নিযুক্ত করেন। এই মহিলার পৌত্র পোপ দ্বাদশ জনই প্রথম অটোকে পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেন।

জার্মান সম্রাট প্রথম অটো দ্বাদশ জনকে লম্বার্ড রাজার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তার বিনিময়ে তিনি পোপকে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে ঘোষণা করতে। অটোর পরবর্তী জার্মান সম্রাটগণ সকলেই রোমের পোপদের নিযুক্ত করতেন এবং প্রত্যেকেই রোমে গিয়ে পোপের দ্বারা পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হতেন। এ ভাবে রোমান

www.pathagar.com

সম্রাটদের দ্বারা নিযুক্ত হওয়ার ফলে পোপের স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হত। শুধু তাই নয়, অন্যান্য দেশের চার্চগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পোপ অসমর্থ হতেন।

খৃষ্টজগতের ধর্মগুরু পোপের পক্ষে এ ভাবে সামন্তরাজা বা জমিদারের অধীনস্থ হওয়া রীতিমত অপমানজনক বিবেচিত হওয়ায় পোপ নিজেকে সামন্ত অধীনতা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হলেন। সামন্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টার অর্থ এই নয় যে পোপ সামন্তপ্রথাকে আঘাত করতে বা এর অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। আপাতবিরোধী মনে হলেও, এই প্রচেষ্টার পিছনে পোপের আসল উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রথাকেই টিকিয়ে রাখা এবং ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামন্তপ্রভু হিসাবে সবার উপরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দশম শতাব্দীতে ফ্রান্সের বার্গাণ্ডি প্রদেশের ক্লুনি নামক মঠে এক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। যদিও মঠের সন্ন্যাসীদের সর্বপ্রকার দুর্নীতি, কলুষতা, অনাচার থেকে মুক্ত করা এ সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মঠ ও চার্চকে সামন্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ক্লুনি সংস্কার আন্দোলনের দ্রুত বিস্তৃতি ও এর প্রভাব রোমের পোপ হিল্ডেব্রাণ্ডকে অনুপ্রাণিত করেছিল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করতে।

একাদশ শতাব্দীতে হিল্ডেব্রাণ্ড সপ্তম গ্রেগরী নাম ধারণ করে রোমের পোপ নিযুক্ত হন। সামন্তপ্রথা অনুযায়ী নবনিযুক্ত পোপকে সম্রাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার পদে অধিষ্ঠিত করতেন এবং কর্তৃত্বের চিহ্নসম্বলিত দণ্ড ও অঙ্গুরী প্রদান করতেন। এই অনুষ্ঠানে পোপকে সম্রাট তাঁর জমিদারীও প্রদান করতেন।

সম্রাটের হাত থেকে কর্তৃত্ব পাওয়ার এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পোপ ঘোষণা করেন তিনি (পোপ) ঈশ্বরের নিকট থেকে সরাসরি ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরিত। অতএব তিনি এই পৃথিবীর কারও অধীনস্থ নন এমন কি কারও কাছে স্বীয় কর্মের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। উপরন্তু তিনি দাবি করলেন পৃথিবীর সকল মানুষ এমন কি সম্রাটও পোপের অধীনে। ইউরোপের সকল চার্চের ধর্মযাজকদের তিনি নির্দেশ দিলেন সামন্ত জমিদার বা রাজার আনুগত্য অস্বীকার করে সরাসরি পোপের অধীনতা মেনে নিতে।

www.pathagar.com

পোপ সপ্তম গ্রেগরীর আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট চতুর্থ হেনরী জার্মানীর বিশপদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করে হিল্ডেব্রাণ্ডকে পোপের পদ থেকে বহিষ্কার করার কথা ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে হিল্ডেব্রাণ্ড চতুর্থ হেনরীকে পোপের ক্ষমতা অনুসারে খৃস্টান জগৎ থেকে বহিষ্কার (excommunicate) করেন। পোপের এই বহিষ্কার অর্থ আদেশের হল হেনরীকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করা এবং তার প্রজাদের প্রতি সম্রাটকে অমান্য করার নির্দেশ দেওয়া। পোপের এই ঘোষণায় প্রভাবিত হয়ে জার্মান সামন্তপ্রভুরা হেনরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাধ্য হয়ে হেনরী পোপের কাছে মার্জনা প্রার্থী হলেন। ভয়ঙ্কর শীতের মধ্যে সুউচ্চ আল্পস পর্বত অতিক্রম করে বহুকষ্টে কয়েকজন সঙ্গীসহ হেনরী ইতালীতে পৌঁছান। পোপ তখন ক্যানোসায় অবস্থান করছিলেন। তিন দিন তিন রাত সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে খালি পায়ে সম্রাট পোপের প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন সাক্ষাৎ লাভের আশায়। চতুর্থদিনে পোপ তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন এবং পোপের পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার পরই শুধুমাত্র পোপ হেনরীর উপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেন। মধ্যযুগে ধর্মের প্রভাব কতখানি প্রবল ছিল এ ঘটনা তারই একটি প্রমাণ। দেশে ফিরেও হেনরী কিন্তু এই অপমানের কথা ভুলতে পারেন নি। পর বৎসর সসৈন্যে তিনি রোমে অভিযান প্রেরণ করেন এবং সপ্তম গ্রেগরীকে পদচ্যুত করে সেখানে নিজের অনুগত লোককে বসান। পরাজিত গ্রেগরী দক্ষিণ ইতালীতে পলায়ন করেন। সেখানে নর্মানদের আশ্রয়ে ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হেনরী ও হিল্ডেব্রাণ্ডের মধ্যকার কলহ তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এবং ১১২২ সালে ওয়ার্মস-এর চুক্তি (Treaty of worms) দ্বারা এ সংঘর্ষের সাময়িক অবসান ঘটে। এ চুক্তিতে উভয়পক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চার্চের বিশপগণ ভবিষ্যতে পোপ বা তাঁর প্রতিনিধিদের দ্বারা অভিষিক্ত হবেন; কিন্তু অভিষেক অনুষ্ঠান জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হবে সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। সম্রাট তাঁকে সব ভূখণ্ডও দান করবেন অর্থাৎ তাঁর উপর রাজনৈতিক ক্ষমতা আরোপ করবেন।

এই চুক্তির তিন বছর পরই কলহ নতুন পর্যায়ে উপস্থিত হল। পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ও সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসার মধ্যে সংঘটিত এই

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শতাব্দী থেকে কৃষি ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কারিগরি উন্নতি ঘটার ফলে উভয়েই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হস্তশিল্পে নিয়োজিত কারিগরগণ, যথা, কামার, কুমার, তাঁতি, ছুতোর প্রভৃতি এক একজন এক এক পেশায় বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করে। এর ফলে কৃষির মতো হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্পেও উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কারিগরগণ এখন শুধুমাত্র তাদের উৎপাদিত সামগ্রী দিয়েই সামন্ত প্রভুকে খাজনা দিতে পারত। এদের উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সামন্তপ্রভুকে খাজনা দিয়ে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও তাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকত। উন্নত কারিগরদের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা গ্রামের মধ্যে খুব বেশী ছিল না। কাজেই সামন্ত প্রভুর অনুমতি নিয়ে এরা ম্যানরের বাইরে তাদের পণ্য বিক্রীর জন্যে নিয়ে যেত। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে যে গ্রাম্য মেলা বসত সেখানেও তারা তাদের পণ্য নিয়ে বিক্রী করত। ম্যানরের বাইরে কারিগরগণ তাদের পণ্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আগত বণিকদের কাছে বিক্রি বা বিনিময় করত। এজন্য বিদেশী বণিকগণ যে পথ দিয়ে যাওয়া আসা করত সে পথেরই ধারে এরা নিজেদের পণ্য নিয়ে বসে থাকত। এভাবে একদল কারিগর চিরতরে ম্যানর ছেড়ে চলে এল। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক সামন্তপ্রভুকে এককালীন বেশ কিছু পণ্য বা অর্থ দিয়ে মুক্তি পণ জোগাড় করল। অন্যরা আবার পালিয়েই চলে এল। এ সকল পলাতক কারিগরদের আর ধরা গেল না। ম্যানর থেকে আগত হস্তশিল্পী বা কারিগর শ্রেণী অন্য কোনো সামন্তপ্রভুর ম্যানরের পাশে বা কোনো মঠের ধারে বসতি স্থাপন করল। এরা এমন সকল স্থান বসতির জন্যে নির্বাচন করল যেখান থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রী হওয়া সহজ এবং যেখানে কাছের গ্রাম থেকে খাদ্য ও অন্যান্য কাঁচামাল পাওয়া সম্ভব। কালক্রমে এ সকল কারিগর ও বণিকদের বসতিগুলিকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগের শহরগুলি গড়ে ওঠে। ডাকাত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে শহরবাসীগণ তাদের শহরের চারদিকে দুর্ভেদ্য উঁচু প্রাচীর গড়ে তোলে। শহরের মধ্যে একাধারে পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে পণ্য কেনাবেচা হতে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ম্যানর থেকে কৃষকরাও তাদের কৃষি পণ্য শহরের বণিকদের কাছে বিক্রী করে নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যেত। এভাবে গ্রাম ও শহর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

সামন্ত-প্রভুর অত্যাচারে নির্যাতিত বহু কৃষকও পালিয়ে শহরে আসতে শুরু করে কারণ শহর ছিল মুক্ত অঞ্চল। এখান থেকে কেউ তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারত না।

প্রথমদিকে শহরগুলি কোন না কোন সামন্তপ্রভুর জমিদারীর এলাকাভুক্ত ছিল; কাজেই সে কারণে সামন্ত-প্রভুর বিশেষ অধিকার বলবৎ থাকত শহরের উপরে। সামন্ত জমিদার শহরবাসীর কাছ থেকে নিয়মিত খাজনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র আদায় করত। সৌখীন শিল্প ও বিলাসদ্রব্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ তাদেরকে শহরগুলির উপর আরও নির্ভরশীল করে তুলল। অন্য-দিকে শহরগুলিকেও জমিদারের নিত্য নূতন ভোগের সামগ্রী ও অর্থের জোগান দিতে হত। ফলে সংঘবদ্ধভাবে নগরবাসীরা জমিদারের ক্রমবর্ধমান অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কোন কোন স্থানে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জমিদারদের পরাজিত করে শহরগুলি সামন্তপ্রভুর অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করল। ইতালী, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড ও জার্মানীর নগরগুলি এখন স্বাধীনভাবে গড়ে উঠল। তারা নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, মিউ-নিসিপ্যাল কাউন্সিল, আদালত, সৈন্যবাহিনী ও অর্থ দফতর গড়ে তুলল। শহরবাসীগণ ব্যক্তিগতভাবেও স্বাধীনতা অর্জন করল। কোন কৃষক এক বৎসর শহরে বাস করলে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার লাভ করত। তবে মনে রাখা দরকার যে সামন্ত যুগের শহরগুলো সামগ্রিকভাবে সামন্ত ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে জমিদারদের সাথে বিরোধ ঘটলেও কালক্রমে এ শহরগুলো সামন্ত ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। এ সকল শহরে যেসব শিল্প গিল্ড কাজ করত সেগুলোও সামন্ত ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

গিল্ড প্রথা

সামন্তযুগের শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কারিগরি ও হস্তশিল্প। উৎপাদন-প্রথা ও যন্ত্রপাতি ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ থাকলেও শিল্পের অভ্যন্তরে কোনো শ্রমবিভাগ ছিল না। অর্থাৎ কারখানার ভিতরে প্রতিটি কারিগরকেই আগাগোড়া সম্পূর্ণ কাজ করতে হত। কারি-গররা নিজেরাই ছিল উৎপাদনযন্ত্রের মালিক, কাঁচামালও সাধারণত

www.pathagar.com

নিজেরাই সংগ্রহ করত। কারিগর তার তৈরী জিনিসপত্র সরাসরি খদ্দেরের কাছে বিক্রী করত। বলা বাহুল্য এই কারিগরি শিল্প সামন্ত অর্থনীতি থেকে একটু পৃথক ধরনের ছিল। কৃষক যে ফসল উৎপন্ন করত তার একটা অংশ যেত জমিদারের ভোগে, আর বাকীটা সে নিজে ভোগ-ব্যবহার করত। কারিগর কিন্তু তার উৎপাদিত দ্রব্য নিজে ভোগ-ব্যবহার করত না, পণ্য হিসাবে বিক্রী করত।

সামন্তযুগে যৌথ জীবনযাত্রাই ছিল রীতি। সামন্ত উৎপাদন প্রথার বৈশিষ্ট্যের কারণে সামাজিক সহযোগিতার জন্য জোট বাঁধাই ছিল যে যুগের রীতি। সামন্ত যুগের শিল্প সংগঠনে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী এবং কারিগররা সংঘ বা গিল্ড গঠন করত। প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিল বণিকদের সংঘ। পথে ঘাটে ডাকাতির উপদ্রব এড়াবার জন্যে বণিকরা বাণিজ্য যাত্রার সময়ে দল গড়ত। কালক্রমে এগুলোই স্থায়ী সংঘের রূপ নেয়। এই সংঘগুলোতে বণিক ও কারিগররা কাঁচামাল কিনে তৈরী মাল বিক্রী করত বলে তাদেরও ব্যবসায়ী বলে গণ্য করা হত। গিল্ড বণিকদের শহরের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল।

কালক্রমে হস্তশিল্পী ও কারিগরদের নিজস্ব গিল্ড গড়ে ওঠে। এক একটা শিল্পকে কেন্দ্র করে এক একটা গিল্ড হত। গিল্ডের গঠন বিন্যাস ছিল এ রকম: (১) গিল্ড মাষ্টার বা পূর্ণ সদস্য—এরা ওস্তাদ কারিগর; (২) জার্নিম্যান—এরা সহকারী কারিগর; এবং (৩) শিক্ষানবিস (এপ্রেন্টিস)। শুরুর দিকে গিল্ডের নিয়মানুসারে শিক্ষানবিসরা কাজ শিখলে জার্নিম্যান হত এবং জার্নিম্যানরা গিল্ড মাষ্টারে উন্নীত হত। কালক্রমে ওস্তাদ কারিগরেরাই গিল্ডের সর্বময় কর্তা হয়ে বসে এবং জার্নিম্যান ও শিক্ষানবিসদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করতে থাকে।

সামন্তযুগের এ গিল্ডগুলোর প্রধান দায়িত্ব ছিল গিল্ড সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গিল্ডের সাথে সামন্তপ্রভুর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। এ ছাড়া বাইরের প্রতিযোগিতা নষ্ট করাও গিল্ডের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল উদ্দেশ্যে বহু নিয়মকানুনের প্রচলন হয়। সদস্যদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে গিল্ড সামন্ত-প্রভুর পাওনা চুকিয়ে দিত। সদস্যদের ভিতর প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সকলকে সমান সুযোগ দেয়ার জন্যে গিল্ড

www.pathagar.com

উৎপাদনের প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করত। প্রত্যেক কারিগরকে নির্দিষ্ট বাজারে কাঁচামাল কিনতে হত, কাঁচামাল নিজে ব্যবহার না করে অন্যকে বিক্রী করা চলত না। উৎপাদিত পণ্য বিক্রী করতে হত নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট দামে; যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সুনির্দিষ্ট ছিল। জানিম্যান ও শিক্ষানবিশ নিয়োগ ও তাদের মজুরীর হার স্থির করত গিল্ড। গিল্ডের নিয়ম ভাঙলে জরিমানা ও মাল বাজেয়াপ্ত করা হত, এমনকি শহর থেকেও বের করে দেয়া হত।

এ ছাড়া ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের দিনে গিল্ড পান-ভোজনের আয়োজন করত। এমনকি দুঃস্থ কারিগর ও তার পরিবারকে সাহায্য করাও গিল্ডের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শহরবাসীর নিরাপত্তা রক্ষার ভারও গিল্ড গ্রহণ করত।

বার্গার শ্রেণী

সামন্তযুগের শেষদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে শহর-গুলোতে নতুন শ্রেণীর উদয় হতে থাকে। এরা হল : ব্যাঙ্কার, ধনী বণিক, সুদখোর মহাজন। এদেরকে বলা হত বার্গার (শব্দটি জার্মান ভাষার বুর্গ বা শহর কথাটি থেকে উদ্ভূত)। প্রধানত বাণিজ্যেই এদের সম্পদের মূল। উপরে বর্ণিত গিল্ড বণিকদের সাথে নতুন যুগের বার্গারদের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। গিল্ড বণিকরা ছিল একই সাথে কারিগর ও বণিক এবং শহরের শিল্প বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল তাদের। কিন্তু বার্গাররা কারিগর ছিল না, এরা অন্যের উৎপাদিত পণ্য বিক্রী করত। মধ্যযুগের শেষদিকে যখন বাণিজ্যের পরিধি দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রূপ নিতে শুরু করে, গিল্ড উৎপাদন প্রথা ততই যুগের তুলনায় পশ্চাদপদ বলে প্রমাণিত হয় এবং গিল্ড সংগঠনের সাথে বার্গার শ্রেণীর বিরোধ ক্রমেই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। গিল্ড প্রতিযোগিতা দূর করা এবং নিজ স্বার্থরক্ষার দিকে যতটা মনোনিবেশ করত যান্ত্রিক আবিষ্কার ও উন্নতির দিকে ততটা নয়। ববং কোন কারিগর নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করলে সেটা বন্ধ করে দেয়া হত এবং কারিগরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হত। গিল্ডপ্রথা তাই উৎপাদন বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়। বাজারের আয়তন বেড়ে গেলে গিল্ডগুলো চাহিদা মেটাবার জন্যে নতুন

www.pathagar.com

শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে নতুন গিল্ড স্থাপন করে অর্থাৎ পুরো জিনিসটা না বানিয়ে এক একটা গিল্ড এক একটা অংশ তৈরী করতে শুরু করে। এভাবে গিল্ডগুলো আংশিক শ্রমবিভাগের মারফত হস্তশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। কিন্তু কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ কখনও চালু হয় নি। শ্রমিকও তার উৎপাদন যন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। গিল্ডের নিয়মানুযায়ী গিল্ড মাষ্টার নিজ শিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্পে জার্নিম্যানদের নিয়োগ করতে পারত না। গিল্ডের শিক্ষানবিস ও জার্নিম্যানদের সংখ্যা সীমিত থাকার ফলে গিল্ড মাস্টার কখনও পুঁজিপতি হতে পারে নি। অপরপক্ষে বণিকরা সব রকম পণ্যই গিল্ড কারিগরদের কাছ থেকে কিনতে পারত কিন্তু মজুরের শ্রম সে কিনতে পারত না। ফলে তার পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। বণিকের পুঁজিকে সবরকমে প্রতিহত করার চেষ্টা করত গিল্ডগুলো।

সে সময়ে উৎপাদনের বিকাশের জন্যে দুটো কাজ অত্যাবশ্যক ছিল: কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ—যেটা ছাড়া ব্যাপক হারে পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়; এবং শ্রমিকের হাত থেকে উৎপাদন যন্ত্রকে পৃথক করে সেটাকে পুঁজিবাদের পুঁজিতে পরিণত করা। এ দুটো ছিল পুঁজিবাদের বিকাশের আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। এ শর্ত পূরণ করতে পারত বার্গার শ্রেণী, গিল্ড নয়।

মধ্যযুগের শেষপর্বে গিল্ডগুলোর সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষে বার্গার শ্রেণী শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করে। বার্গারদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে সমগ্র দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তৃত হয়। সাথে সাথে দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও অনুভূত হয়। সামন্তপ্রভুদের কলহ, বিবাদ লড়াই ও লুঠতরাজ ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে দেখা দেয়। এ বাধা দূর করার জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে সমগ্র দেশে আইন ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা। এ জন্য বার্গারশ্রেণীর নিজ নিজ দেশের রাজার হাতকেই শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। বার্গারশ্রেণী রাজাকে শুধু অর্থ সাহায্যই করে নাই, সশস্ত্র লোকজন দিয়ে রাজার সৈন্য-বাহিনী গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এই বার্গারদের সাহায্যেই ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ সামন্তপ্রভুদের দমন করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

ক্রুসেড

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীব্যাপী সমগ্র ইউরোপে এক প্রচণ্ড ধর্মোন্মাদনার সূত্রপাত হয় যার পরিণামে ইউরোপের খৃষ্টান ও প্রাচ্যের মুসলিমদের মধ্যে কয়েকবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। ইতিহাসে এই সংঘর্ষের নাম দেয়া হয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। সেলজুক তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত খৃষ্টানদের ধর্মস্থান প্যালেস্টাইনের উদ্ধার এই যুদ্ধের প্রাথমিক কারণ বলে পরিগণিত হলেও আসলে ক্রুসেডের পশ্চাতে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

ক্রুসেডের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন খৃষ্টজগতের ধর্মগুরু পোপ। পোপই ক্রুসেডের আয়োজন, সংগঠন ও অর্থ জোগানোর ভার নেন এবং সমগ্র ক্রুসেডের পরিচালনা ভার তিনিই গ্রহণ করেন। এ কাজের পশ্চাতে তাঁর নিজস্ব লক্ষ্য সাধনই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

ক্রুসেডকে পোপের বৈদেশিক নীতির বাস্তবায়নরূপে আখ্যা দেয়া হয়। একাদশ শতাব্দীতে পবিত্র রোমান সম্রাটের সাথে পোপের কলহ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত এবং পোপের অবস্থা গভীর সঙ্কটাপন্ন, সে সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এবং সেই সঙ্গে সম্রাটের উপর নিজে ক্ষমতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই পোপ ক্রুসেডের আহ্বান করেন। অবশ্য ঠিক সময়ে এ সুযোগ উপস্থিত হওয়ার ফলেই পোপের পক্ষে তার সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়েছিল।

খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবের পর থেকেই যীশুখৃষ্টের জন্মভূমি জেরুজালেম নগরী খৃষ্টানদের নিকট পবিত্র স্থানরূপে বিবেচিত হত এবং প্রতি বৎসর বিপুলসংখ্যক খৃষ্টান তীর্থযাত্রী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে তীর্থ কর্ম করার উদ্দেশ্যে জেরুজালেমে গমন করতেন।

সপ্তম শতাব্দীতে এই জেরুজালেম নগরী আরব মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হয়। কিন্তু আরবগণ খৃষ্টানদের তীর্থকর্ম বা অন্যান্য কাজে কখনই হস্তক্ষেপ করে নি। কাজেই বিদেশী ও বিধর্মীদের দ্বারা অধিকৃত হলেও খৃষ্টানগণ জেরুজালেম নগরীতে তাদের উপর কোনো নির্যাতন অনুভব করে নি।

দশম শতাব্দীর ক্লুনি সংস্কার আন্দোলনের ফলে খৃষ্টানদের মধ্যে ধর্মানুরাগ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং আরও বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী জেরুজালেমে গমন

www.pathagar.com

করেন। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কীগণ জেরুজালেম নগরী অধিকার করার পর খৃষ্টানদের উপর তারা নির্যাতন শুরু করে। এসব নির্যাতনের কাহিনী আরও অতিরঞ্জিত রূপে ইউরোপে পেঁছালে সেখানকার খৃষ্টানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে সেলজুক তুর্কীগণ আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এশিয়া মাইনরের অংশটুকু অধিকার করে। ক্রমশ তারা রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাইজেন্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস কমনেনাস উপায়ান্তর না দেখে পোপ দ্বিতীয় আরবান-এর নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন করেন। পোপ এই আবেদনের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। পবিত্র জেরুজালেম নগরী বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করার নামে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পোপ সকল খৃষ্টানকে ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

পোপের আহ্বানে ইউরোপের সকল শ্রেণীর জনগণ ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্যে সমবেত হলেও প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নরূপ।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ইউরোপে সামন্তপ্রথা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে এক ছটাক জমিও আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে ইউরোপে সামন্ত-প্রথার আর প্রসার লাভ সম্ভব ছিল না। সামন্ত জমিদারগণ এবার পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করে। বিপুলসংখ্যক সামন্ত-প্রভু প্রাচ্যদেশে নতুন ভূখণ্ড অধিকার করে সেখানে সামন্তপ্রথার প্রবর্তন এবং নতুন লোকদের সার্ফ বানিয়ে তাদের শোষণ করে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এই যুদ্ধে যোগ দেয়। পোপও তাদের এই সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। তাছাড়া পোপ সামন্ত-প্রভুগণকে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে অযথা রক্তপাত ও শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে ধর্মযুদ্ধে সে শক্তি নিয়োজিত করারও নির্দেশ দেন। শুধুমাত্র সামন্ত-প্রভু নয় সকল শ্রেণীর প্রজাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন লোভের উপকরণের আশ্বাস দেয়া হয়। সার্ফদের বলা হয়, যদি তারা ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তবে তারা সামন্ত-প্রভুদের নির্যাতন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করে নূতন দেশে জমি নিয়ে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য করতে পারবে। বেকার ভবঘুরেদের প্রাচ্যদেশে কর্ম সংস্থানের আশ্বাস দেওয়া হয়। এমন কি চোর ডাকাত ও অন্যান্য সমাজবিরোধীদেরকেও আইনের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে প্রাচ্যদেশে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

তাছাড়া বলা হয় যুদ্ধের দ্বারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া যাবে। আর যুদ্ধে নিহত হলেও সে শহীদের মর্যাদা অর্জন করবে এবং সরাসরি স্বর্গে গমনের সুযোগ পাবে। পোপের এ সকল প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করে ইউরোপের সকল শ্রেণীর খৃষ্টান পোপের পতাকাতলে সমবেত হয়। শুধুমাত্র ইতালীর বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পোপকে এরা অর্থ ও জাহাজ দ্বারা সাহায্য করেছিল। এ সকল ইতালীয় বণিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ক্রুসেডের মাধ্যমে তৎকালীন সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে শক্তিহীন করে তার বাণিজ্য পথগুলি দখল করা। ক্রুসেডে যোগদানকারী সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ইতালীয় বণিকগণই ছিল অত্যন্ত চতুর। ক্রুসেডের মাধ্যমে অন্যদের উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও ইতালীর বণিকরা তাদের নিজস্ব স্বার্থ পরিপূর্ণভাবে চরিতার্থ করেছিল।

১০৯৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ক্লারমন্ট নামক স্থানে পোপ দ্বিতীয় আরবান সামন্তপ্রভুদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় পোপ ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং পবিত্র জেরুজালেম নগরী পুনরুদ্ধার যে ঈশ্বরেরই একান্ত ইচ্ছা সে কথা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন। অন্যদিকে 'দুধ ও মধু' দ্বারা প্লাবিত প্রাচ্যদেশে তারা যে বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে পারবে—সে লোভনীয় দিকটিও তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। পোপের অনুরাগীগণ বিশেষত, পিটার দি হার্মিট কৃষকদের মধ্যে ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে প্রচার করে তাদের ক্রুসেডে যোগদানের জন্যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। পোপের নির্দেশে সকল শ্রেণীর জনগণ কাঁধে পবিত্র ক্রুশ বহন করে ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্যে সমবেত হয়। এ ক্রুশ বা ক্রস থেকেই ক্রুসেড নামের উৎপত্তি হয়।

১০৯৬ সালের প্রথমভাগে একদল অসংগঠিত লোক, প্রধানত কৃষক ও বিত্তহীন জনগণ, পিটার দি হার্মিট–এর নেতৃত্বে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সংখ্যায় তারা বহু হলেও গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে তাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় যে কোনো শহরে উপনীত হয়েই তারা স্থানীয় অধিবাসীদের প্রশ্ন করত সেটা জেরুজালেম কিনা! পথিমধ্যে গ্রাম ও জনপদগুলি ধ্বংস ও লুঠতরাজ করতে করতে তারা অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলে উপনীত হয়। ভীত সন্ত্রস্ত বাইজেন্টাইন সম্রাট এদের

www.pathagar.com

অগ্রসর হননি। এর পরই কনস্টান্টিনোপলে ল্যাটিন চার্চের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য এ অধিকার বেশীদিন স্থায়ী হয় নি।

চতুর্থ ক্রুসেডই মোটামুটিভাবে শেষ বড় রকমের অভিযান। এর পরে আরও কয়েকটি ছোটখাট ক্রুসেড সংঘটিত হয়। এর মধ্যে শিশুদের ক্রুসেড অন্যতম। ধর্মীয় উন্মাদনা ও হীন স্বার্থবোধ কতখানি মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, এ ক্রুসেড তার আরেকটি প্রমাণ। ইউরোপের সকল দেশের শিশুদের একত্রে সমবেত করে জাহাজযোগে প্রেরণ করা হয়। পথিমধ্যে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করে ও বাকী হতভাগ্য শিশুদের ইতালীয় বণিকগণ ক্রীতদাসরূপে আরব বণিকদের নিকট বিক্রী করে।

প্রতিটি সামরিক অভিযানের ব্যর্থতায় ইউরোপের খৃষ্টানগণের মনোবল ক্রমশই ভেঙ্গে পড়তে থাকে। কাজেই পোপের পুনঃ পুনঃ আবেদন মানুষের মনে আর সাড়া জাগাতে সমর্থ হয় নি। ইতিমধ্যে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর শাসনের পর খৃষ্টানরা ১২৬১ খৃষ্টাব্দে বাইজেন্টীয়গণ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল থেকে বিতাড়িত হয়। এরপর ল্যাটিন ও গ্রীক (বাইজেন্টাইন) গীর্জার মধ্যে পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পায়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ক্রুসেডের উন্মাদনা কমে আসে। ১২৯২ সালের পর আর কোনো ক্রুসেড হয় নি। পোপ যদিও ক্রুসেডের নামে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন, ক্রমেই তা ব্যর্থ হয়। জনগণ বিদ্রূপ করে পোপের প্রতিনিধির সামনেই ভিক্ষুককে পয়সা দিত কিন্তু ক্রুসেডের জন্য দিত না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংঘটিত অষ্টম ক্রুসেডই শেষ ক্রুসেড এবং এর মধ্যেই প্রাচ্যদেশে অর্জিত সকল এলাকাই খৃষ্টানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

দু'শ বছর স্থায়ী ক্রুসেড পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

ক্রুসেডের ফলে সর্বাপেক্ষা লাভবান হয় উত্তর ইতালীর নগরসমূহ যথা, জেনোয়া, ভেনিস ও পীসা। চতুর্থ ক্রুসেডে বিধ্বস্ত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পথগুলি ইতালীর নাবিকদের হস্তগত হওয়ার ফলে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে এদেরই পুরোপুরি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরিয়া ও প্যালে-

www.pathagar.com

স্টাইনের বন্দরগুলি ইতালীর নাবিকদের দখলে আসে এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলে তারা নিজস্ব বাণিজ্য ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে।

এর ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক আবার প্রতিষ্ঠিত হয় —যা একদা রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছিল। নতুন নতুন পণ্যসামগ্রী প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারে চালান যাওয়ার ফলে ইউরোপবাসী সর্বপ্রথম এগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। চাল, সূতীবস্ত্র, সিল্ক, আয়না, মশলা, সুগন্ধী, বিলাসদ্রব্য, লেবু, এপ্রিকট, তরমুজ প্রভৃতি আরব বণিকদের থেকে ক্রয় করে ইতালীর বণিকগণ ইউরোপে পাঠাত। এর ফলে ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও সামন্তপ্রভুদের জীবনে বিলাসিতার প্রচলন ঘটে। অন্যদিকে প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী আমদানীর ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনেও সচ্ছলতার আভাস দেখা দেয়। ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বহু বছরের সামন্ত অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

ক্রুসেডের ফলে সামন্তপ্রথার ভাঙ্গন অন্যভাবেও ত্বরান্বিত হয়। বহু সামন্ত জমিদার ক্রুসেডে যোগদানের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্যে তাদের জমিজমা এমনকি শহরগুলির উপরও তাদের সামন্ত স্বত্ব বিক্রি করে দেয়। এদের অধিকাংশই ক্রুসেডে মারা যায় এবং যারা শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে সক্ষম হয় তারাও নিঃস্ব কপর্দকশূন্য ভিখারীতে পরিণত হয়। ফলে সাধারণভাবে সমগ্র ইউরোপে সামন্তপ্রভুদের শক্তি ভীষণভাবে খর্বিত হয়। অন্যদিকে এর সুযোগ নিয়ে কয়েকটি দেশের রাজা (যেমন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি) নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। সামন্তপ্রভুদের উচ্ছেদ করে তাঁরা নিজেরাই প্রজাদের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর আরোপ করেন। অন্যদিকে ক্রুসেডের দ্বারা সারা ইউরোপে যে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পোপের ক্ষমতা প্রথম দিকে বৃদ্ধি পেলেও ক্রমশ যখন ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী ইউরোপের জনগণের কর্ণগোচর হতে থাকল—তখন ধীরে ধীরে পোপের প্রতি লোকের আস্থাও কমে যেতে লাগল। ক্রুসেডের শেষে পোপ ও ধর্মের প্রতি সাধারণভাবে জনগণের বিশ্বাস আরও বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। এবং পোপ ও তাঁর সহযোগীদের কার্যকলাপ তখন থেকেই মানুষের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

কিন্তু ক্রুসেডের ফলে ইউরোপবাসীর মানসিক চেতনার যে প্রসার ঘটে তার মূল্যই সর্বাধিক। প্রাচ্যের উন্নততর সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার ফলে সমগ্র ইউরোপের চেতনার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আরবদের মাধ্যমেই কেবল ইউরোপের জনগণ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার সাথে পরিচিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান বিশেষভাবে তাদের প্রভাবিত করে। মুসলমানরা গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত গ্রেকো রোমান গ্রন্থগুলো আরবীতে অনুবাদ করেছিল। সেগুলো আরবী থেকে পুনরায় ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

অন্যদিকে নতুন দেশ ও জনগণের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে ও রীতিনীতিতে তারা গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়। সর্বোপরি ক্রুসেডের ফলে মানুষের মনে অজানাকে জানার যে আগ্রহের সৃষ্টি হয় তা শুধু পরবর্তীকালের ভৌগোলিক আবিষ্কারেরই প্রেরণা জোগায়নি, মধ্যযুগের বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির ও সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে তার চেতনাকে বহুদূরে প্রসারিত করেছে। এই চেতনার উৎকৃষ্টতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের মাধ্যমে।

সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়

ইউরোপে কৃষক বিদ্রোহ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ইউরোপে একদা সামন্তপ্রথার উৎপত্তি হয়েছিল। যে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার সাথে সাথে সামন্ত প্রথার অবক্ষয় সূচিত হল। এ অবক্ষয়ের মূল কারণ হল সামন্ত ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসংগতি ও শ্রেণীবিন্যাস।

যে সমস্ত অসংগতি সামন্ত যুগের সামাজিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে প্রধান হল: (১) সামন্ত প্রভু ও কৃষক তথা ভূমিদাসের বিরোধ (২) সামন্ত প্রভুদের নিজেদের মধ্যকার অধিকারের লড়াই (৩) গিল্ডগুলোতে কারিগর (গিল্ডমাষ্টার) এবং জানিম্যানদের বিরোধ (৪) বণিক তথা বার্গারদের সাথে সামন্ত শক্তির বিরোধ।

www.pathagar.com

এদের মধ্যে সামন্তপ্রভু এবং কৃষকদের মধ্যকার বিরোধটাই সামন্তযুগের মূল অসংগতি। সামন্ত অর্থনীতি এবং সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এই মূল অসংগতিকে কেন্দ্র করে। সামন্ত অর্থনীতি এবং উৎপাদনের ভিত্তি ছিল কৃষক—বার্গার নয়, গিল্ড মাষ্টার নয়, জার্নিম্যান নয়। সামন্ত ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছিল কৃষক ও ভূস্বামীর সম্পর্কের দ্বারা। এবং এই সামন্ত ব্যবস্থার পক্ষছায়ায় জন্মলাভ করেছিল গিল্ডগুলো এবং বণিক শ্রেণী। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে প্রথম অবস্থায় গিল্ডগুলো ছিল সামন্তকৃষি অর্থনীতিরই পরিপূরক।

প্রথম অবস্থায় সামন্ত ব্যবস্থা মানব সভ্যতার অগ্রগতির বাহন হিসাবে কাজ করেছে। লৌহযুগের যে সকল যান্ত্রিক আবিষ্কারসমূহের প্রয়োগ ইতিপূর্বে সম্ভব হয়নি অথবা হলেও কেবল কয়েকটা শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, সামন্ত যুগে সে সকলের সফল প্রয়োগের সাহায্যে সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে দৃঢ়ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কালক্রমে সামন্ত ব্যবস্থাই আবার উৎপাদন প্রথার বিকাশের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সামন্ত যুগের উৎপাদন প্রথা খুবই অনুন্নত হওয়ার ফলে অনবরত শোষণের মাত্রা বৃদ্ধিই ছিল শাসক শ্রেণীর ধনবৃদ্ধির একমাত্র পথ। সামন্ত কৃষি ব্যবস্থায় শুধু যে উৎপাদন হার কম ছিল তাই নয়, ক্রমে জমির ফলনও কমে গিয়েছিল। জমির ফলন বৃদ্ধিতে কৃষকদের একেবারেই উৎসাহ ছিল না। কৃষকেরা জানত যে ফসল বৃদ্ধি মানেই জমিদারের হাতে নতুন কর চাপানোর অজুহাত তুলে দেয়া। ভোগলিপ্সু পরস্বাপহারী জমিদারের একমাত্র চিন্তা ছিল কিভাবে প্রজাকে ঠকিয়ে বেশী কর আদায় করা যাবে। এভাবে মাত্রাতিরিক্ত শোষণের ফলে কৃষকরা উৎপাদনে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা সত্যি সত্যি কমে যায়।

এভাবে অবিরাম শোষণে জর্জরিত কৃষকের দরিদ্রতার সাথে উৎপাদনের বন্ধ্যাত্ব যুক্ত হয়ে সামন্ত ব্যবস্থায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে।

কিন্তু চরম শোষিত ও নিষ্পেষিত হলেও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হওয়া খুবই কঠিন ছিল। কৃষকরা বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকার ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ, আলাপ আলোচনা, বোঝাপড়া অথবা সংহতি গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া প্রভুর নিকট নতি স্বীকারের যুগ সঞ্চিত অভ্যাস, অস্ত্র চালনায় শিক্ষা এবং অভ্যাসের অভাব,

www.pathagar.com

বিভিন্ন সামন্ত প্রভুদের স্বভাব এবং প্রয়োজনের তারতম্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে শোষণের মাত্রার পার্থক্য এবং সে কারণে এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার সুযোগের অভাব—এ সবকিছু মিলে কৃষকদের অবদমিত করে রাখিত। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই মধ্যযুগে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোটবড় কৃষক বিদ্রোহ ঘটলেও ষোল শতকের আগে ব্যাপক এবং সাধারণ কৃষক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়নি।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত জ্যাকুয়ারী বিদ্রোহের কথা আমরা পর্বে উল্লেখ করেছি। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত এই কৃষক বিদ্রোহ সমগ্র ফ্রান্সে এক ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করে। একদিকে ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যদের মিলিত অত্যাচার—ও অন্যদিকে ফরাসী সামন্ত প্রভুদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সের কৃষকদের সাধারণ ভাবে বলা হত জ্যাকুস। এই নাম থেকে জ্যাকুয়ারী নামটির উৎপত্তি।

১৩৫৮ সালের মে মাসে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহ শুরু হয়। কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতিও উপরিকল্পনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিদ্রোহের আরম্ভ। সামন্ত প্রভুদের সমূলে বিনাশ করা ছাড়া কৃষকদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই দলবদ্ধভাবে সামন্ত প্রভুদের দুর্গগুলি আক্রমণ করে ধ্বংস করা ছাড়াও কৃষকরা বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রাণ সংহারও করে।

গুইলাম ক্যালে নামক একজন কৃষক নেতা অসংগঠিত বিদ্রোহী কৃষকদের একত্রিত করার বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সর্বদা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাস করার দরুন বিদ্রোহী কৃষকদের একদলের সাথে আরেক দলেও কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না। কাজেই নিজ নিজ সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে এককভাবে আক্রমণ পরিচালনা ছাড়া সুসংগঠিতভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণে তারা অস্বীকৃতি জানায়। ফলে এ বিদ্রোহ অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সামন্তপ্রভুরা প্রথমে হতচকিত ও দিশেহারা হয়ে পড়লেও অল্পদিনের মধ্যে নিজেদের সুসংগঠিত করে নেয় এবং নির্মম হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করে। কৃষকদের গ্রামগুলিতে ব্যাপক হারে আগুন লাগিয়ে, শষ্যক্ষেত্র অগ্নিদগ্ধ করে তাদের এমন নৃশংসভাবে হত্যা করে যে বহুদিন পর্যন্ত ফ্রান্সের বিস্তৃত অঞ্চলে জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

www.pathagar.com

চতুর্দশ শতাব্দীতে সংঘটিত ইংলণ্ডের কৃষক বিদ্রোহ আরেকটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা।

ইংলণ্ডের কৃষকবৃন্দ ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকদের মতই সামন্ত-প্রভুদের নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়েছিল। ইংলণ্ডের শহরগুলি গড়ে ওঠার সাথে সাথে এ নির্যাতনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। শহরের বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের জন্য সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের কাছ থেকে অতিমাত্রায় খাজনা আদায় করতে থাকে।

এ ছাড়া চতুর্দশ শতাব্দীতে ভয়াবহ প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবে ইংলণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়। তখন সার্ফদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাদের চাহিদাও বেড়ে যায়। প্রত্যেক সামন্তপ্রভু তাদের সার্ফকে ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং তাদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে থাকে। কৃষি মজুরদের অল্প মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং পার্লামেন্টের মাধ্যমে আইন পাশ করিয়ে এদের মজুরীর হার কমানো হয়। জেল, জরিমানা চাবুক মারা ইত্যাদি শাস্তির ভয় দেখিয়ে এই আইন কার্যকরী করা হয়।

ইংলণ্ডের রাজাও তাঁর খাজনার হার বৃদ্ধি করতে শুরু করেন—কারণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে দেশে নিদারুণ অর্থসঙ্কট দেখা দেয়। রাজার কর্মচারীগণ জনগণের, বিশেষ করে কৃষকদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে কর আদায় শুরু করে।

এ সমস্ত কারণই কৃষকদের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ১৩৮১ সালের মে মাসের এক দিনে লণ্ডনের উত্তরাঞ্চলের গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে রাজার কর আদায়কারী কর্মচারীদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ ঘটনাই বৃহত্তর বিদ্রোহের সংকেতরূপে কাজ করে।

কুড়াল, তীর ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কৃষককুল প্রায় প্রতিটি গ্রামে রাজকর্মচারী ও অর্থ আদায়কারীদের আক্রমণ করে। তারা বিশেষভাবে সামন্ত প্রভুদের ঘরবাড়ী ও মঠগুলি জ্বালিয়ে দেয়। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন প্রখ্যাত যোদ্ধা ও সংগঠক ওয়াট টাইলার।

দুটি পৃথক স্থানে বিদ্রোহীরা সমবেত হয়। লণ্ডন শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহীরা লণ্ডনের দিকে ধাবিত হয়। স্থানীয় দরিদ্র লণ্ডন-বাসীদের সহায়তায় তারা শহরে প্রবেশ করে এবং আদালত, বিচারকদের

www.pathagar.com

বাসগৃহ, রাজকর্মচারীদের বাসস্থান প্রভৃতিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাজা তাঁর পারিষদবর্গদের নিয়ে প্রাণভয়ে লণ্ডন টাওয়ারে আশ্রয় নেন। বিদ্রোহীরা টাওয়ার অবরোধ করে রাজাকে হত্যা করার ভয় দেখালে রাজা শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সাক্ষাৎ দানে রাজী হন। ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে কৃষকগণ রাজার নিকট ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ, কর্ভি ইত্যাদি বেগার পরিশ্রমের অবসান এবং কৃষিশ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবী জানায়। তা ছাড়া তারা সামন্তপ্রভুদের দ্বারা অধিকৃত পশুচারণ ভূমি, বনভূমি ও অন্যান্য জমি তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার দাবী পেশ করে।

রাজা বিদ্রোহীদের সাথে আচরণে শঠতার আশ্রয় নেন। তিনি কৃষকদের দাবী মেনে নেয়ার মৌখিক স্বীকৃতি দেন বটে কিন্তু তার সৈন্যদল সামন্তপ্রভু ও শহরের ধনী ব্যবসায়ীদের সাথে একত্রিত হয়ে বিদোহীদের আক্রমণ করে ও ওয়াট টাইলারকে হত্যা করে। নেতার এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে কৃষকগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সৈন্যদল তাদের নির্মমভাবে ধ্বংস করে। গ্রামে গ্রামে সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের বিরুদ্ধে তাদের তাঁবেদার সৈন্যদের লেলিয়ে দেয়। কৃষকদের ঘরবাড়ী জালিয়ে দিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যাকরে মৃতদেহগুলি গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয় —ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ বিদ্রোহ করতে সাহস না পায় সেই উদ্দেশ্যে।

প্রাথমিকভাবে এ বিদ্রোহ দমন করা হলেও ইংলণ্ডের সামন্তপ্রভুরা ১৩৮১ সালের পর কোন সার্ফ-এর কাছ থেকে কর্ভি বা বেগার আদায় করতে সাহসী হয়নি। অনেকে আবার মুক্তিপণের বিনিময়ে সার্ফদের মুক্তি দিয়ে দেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ডে ভূমিদাস প্রথা মোটামুটি অবলুপ্ত হয়। কৃষক-দের কাছে জমি ইজারা দেওয়ার পরিবর্তে ইংলণ্ডের সামন্তপ্রভুরা এখন ভেড়া চরাবার উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহারের কাজেই অধিক উৎসাহী হয়ে পড়ে।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ব্যতীত বোহেমিয়ার কৃষক বিদ্রোহ চতুর্দশ শতাব্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এ বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল একদিকে বোহেমিয়ায় জার্মান পুঁজিপতি ও সামন্ত জমিদারদের আধিপত্য ও অন্যদিকে বোহেমিয়ার জমিদার ও চার্চের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোহেমিয়া চতুর্দশ শতাব্দীতে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়েছিল। এই

www.pathagar.com

মধ্যযুগের একজন খৃস্টান সন্ন্যাসী বই দেখে দেখে হাতে লিখে নকল করছেন। এভাবে সন্ন্যাসীরা অনেক মূল্যবান বই নকল করে মধ্যযুগে প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারকে রক্ষা করেছেন। (পৃঃ ২৭)

www.pathagar.com

মধ্যযুগের ইউরোপে জমিদারদের জন্য পশুপাখি শিকার ও মাছ ধরার দৃশ্য। (পৃঃ ৫৪)

তীর ধনুক, বল্লম ও তলোয়ার সজ্জিত নাইটদের যুদ্ধ যাত্রার দৃশ্য। এঁরা যাচ্ছেন ক্রুসেডে যোগ দিতে। (পৃঃ ৫৫, ৭২-৭৩)

www.pathagar.com

সমৃদ্ধিই এর সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় জার্মানীর ঔপনিবেশিক শাসন। বোহেমিয়ার জমিজমা, খনি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চার্চ—সব কিছুর অধিকর্তা জার্মানগণ। এদের শোষণে বোহেমিয়ার জনগণ নিঃস্ব, রিক্ত ও সর্বহারা। বোহেমিয়ার গুটিকয়েক ক্ষুদ্র জমিদারই শুধু কিছু সম্পদের মালিক এবং তারাও শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বোহেমিয়ার চেক জনগণই প্রথম সোচ্চার হয় এই ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ধর্মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হাস। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বিদেশী শোষণ, দেশীয় নির্যাতন ও চার্চের দুর্নীতির স্বরূপ তুলে ধরেন জনগণের নিকট। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য দলে দলে মানুষ ছুটে আসত। জনগণের মনে বিক্ষোভ সঞ্চারিত করার অভিযোগে জন হাসকে কন্সট্যান্স-এর কাউন্সিল-এ (১৪১৫) অভিযুক্ত করা হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত হয়। বিদ্রোহীরা জন হাসের নামের সাথে নিজেদের নাম যুক্ত করে হাসপন্থী নামে পরিচয় দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি গড়ে তুলল তারা। সুরক্ষিত দুর্গের আকারে প্রস্তুত এই ঘাঁটিকে বলা হত ট্যাবর। ১৪১৯ সাল থেকে ১৪৩৭ সাল পর্যন্ত হাসপন্থীরা বিদেশী শাসন, দেশীয় শোষক ও চার্চের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম চলিয়ে যায় এবং কয়েকটি স্থানে বিজয় লাভ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নরমপন্থীদের আপোষমূলক মনোভাব ও দলীয় বিভেদ ঐ বিদ্রোহের শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে।

সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও হাসপন্থীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত বোহেমিয়ায় জার্মান আধিপত্যের অবসান ঘটায়। এ বিদ্রোহ চার্চের ক্ষমতা খর্ব করে এবং ভবিষ্যতের জার্মানীর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। সর্বোপরি এ বিদ্রোহ বোহেমিয়ার জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের পথ খুলে দেয়।

মধ্যযুগের কৃষক বিদ্রোহগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হলেও, সামগ্রিকভাবে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটাতে এরা সক্ষম হয়নি। কৃষকগণ বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামে অবস্থান করত বলে সুসংগঠিত

www.pathagar.com

ভাবে তারা সংঘবদ্ধ হতে পারেনি এবং স্পষ্ট শ্রেণীচেতনাও তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি। প্রত্যেক গ্রামের কৃষকরা তাদের নিজের সামন্ত-প্রভুকেই সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করত এবং তাকে ধ্বংস করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই ব্যাপকভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা হল, সামন্তপ্রভুদের সবচেয়ে বড় শত্রু যে উদীয়মান বার্গার শ্রেণী তাদের সাহায্য ব্যতীত একাকী সংগ্রামে জয়ী হওয়া মধ্যযুগের কৃষকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু কৃষকগণ তাদের পক্ষে মিত্রশক্তি কারা সেটা না বুঝেই অনেক সময় বার্গারদেরও তারা শত্রু মনে করেছে। এ সমস্ত কারণই এ সকল কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী। কাজেই পরবর্তীকালে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে কৃষক বিদ্রোহ নয় বরং বার্গারদের শক্তি। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত সামন্তপ্রথা তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলল। বার্গারদের সাথে অবশ্য কৃষক ও শহরের জনগণ এসে যোগ দিয়েছিল বলেই শেষ পর্যন্ত সামন্তবাদের উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিল।

সামন্তপ্রথার অবক্ষয়ের আরেকটি কারণ এর আভ্যন্তরীণ অসংগতি। সামন্তপ্রথায় প্রাথমিক উৎপাদনকারী হল কৃষকশ্রেণী, কিন্তু অবিরত শোষণের দরুন তাদের শ্রমশক্তির পুরোপুরি ব্যবহার সম্ভব হোত না। কৃষক জানত যে সে যতই উৎপাদন বৃদ্ধি করুক না কেন তা কেবল সামন্তপ্রভুর খাজনা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। এর ফলে সামন্ত যুগে কৃষিতে যতখানি যান্ত্রিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল তাও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায়নি শুধুমাত্র কৃষকদের অনীহার ফলে। অন্যদিকে অনুৎপাদক সামন্তশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উৎপাদনে অংশ গ্রহণ না করার ফলে সামন্তপ্রভুদের কাজই ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা, যুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকা। তারা শুধু কৃষকদের শোষণ করেই ক্ষান্ত থাকত না—ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ধনবৃদ্ধির লালসায় তারা অবিরতই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। সামন্ত প্রভুরা যতই তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। ততই তাদের ভ্যাসালের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ভ্যাসাল ও তাদের পরিবার-পোষ্যদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে এমন পরিমাণ হয়ে দাঁড়াল যে পরশ্রমজীবী মানুষরা বিপুল হারে কৃষকদের শোষণ করা শুরু করল। অন্যদিকে যুদ্ধ-বিবাদ প্রভৃতির ফলে সামন্তপ্রভুদের খরচ অসম্ভব বেড়ে গেল এবং সমস্ত ব্যয়ভারই

www.pathagar.com

গিয়ে পড়ল কৃষক সম্প্রদায়ের উপর। কিন্তু কৃষকদের পক্ষে আর এই খরচ যোগানো সম্ভব হচ্ছিল না। যতই তাদের নির্যাতন করা হোক না কেন সম্পদের পরিমাণ আর বাড়ছিল না। সামন্তপ্রভুরা এই সঙ্কট যতই এড়াবার চেষ্টা করছিল ততই তারা আরও গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত হচ্ছিল। বস্তুতঃ সামন্ত প্রথাকে টিকিয়ে রেখে এই সঙ্কট কখনই এড়ানো সম্ভব ছিল না। কাজেই সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত সামন্তসমাজ ক্রমশঃই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আর এর বিরোধী শক্তিরূপে আবির্ভূত হচ্ছিল বার্গার শ্রেণী।

উদীয়মান বার্গার শ্রেণীই ছিল সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অংশ। রাজশক্তির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তারই সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব এরা ক্রমেই বৃদ্ধি করে যাচ্ছিল। অপ্রয়োজনীয় ও নিষ্কর্মা জমিদার-শ্রেণী যখন সমাজ প্রগতির পথে অন্তরায়রূপে বিরাজ করছিল, তখন এই বার্গার শ্রেণীই সম্পদ সঞ্চিত করে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে উৎপাদন শক্তির ক্রমশঃ বিকাশ ঘটাতে থাকে। এই বার্গার শ্রেণীর নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল সামন্তপ্রথার অবসান ঘটানো। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতায় বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিষেক। বুর্জোয়াদের প্রয়োজন যেমন খুশী কেনা বেচার স্বাধীনতা; কিন্তু সামন্ত ব্যবস্থার শত সহস্র বাধা নিষেধের বেড়াজালের মধ্যে তা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া চায় তার উৎপাদনের কাজে যত খুশী মজুর নিয়োগ করতে, কিন্তু কৃষক বাঁধা পড়ে আছে গ্রামের সামন্ত প্রভুর জমিতে। তাই সামন্তপ্রথার মূল উৎপাটন ভিন্ন বুর্জোয়ার শক্তির বিকাশের আর কোন সম্ভাবনা ছিল না।

তাই সামন্তপ্রথার উচ্ছেদের জন্যই নিয়োজিত হল বুর্জোয়ার সমস্ত শক্তি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কখনও পার্লামেন্টের মাধ্যমে, কখনও গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াদের ক্ষমতার অভিষেক সম্পন্ন হল। এ সময়ের সকল রাজনৈতিক ঘটনা ও সংঘাতের মূল বিষয় একটিই —তা' হল সামন্তশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সংঘর্ষ এবং শেষোক্ত শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল।

www.pathagar.com

ইউরোপে রাজশক্তির উদ্ভব ঃ বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে মধ্যযুগের শেষদিকে উদ্ভূত বণিক সম্প্রদায় যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হ'ল সামন্তপ্রভু ও তাদের সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা। ক্রুসেডের পরে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে সাথে বহির্বাণিজ্যের প্রসারও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আরব-দেশগুলি থেকে আগত নতুন নতুন পথ্য সম্ভার নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে চলাকালে বণিকগণ এই সামন্ত জমিদারদের নিয়োজিত লুটেরা ও ডাকাতদের হাতে পড়ত। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার আর বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় দেশের আভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে। ফলে বণিকসম্প্রদায় সারা দেশে শাসন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে। সামন্ত প্রভুদের খামখেয়ালী ও ঝগড়া বিবাদ—এসবও ছিল বাণিজ্য বিস্তারের প্রবল বাধা। এ সকল বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল সাড়া দেশ জুড়ে এক কেন্দ্রীয় শক্তি স্থাপন করা, যে শক্তি অরাজকতা এবং অনিশ্চয়তা দূর করে শাসনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নিরাপত্তা ছাড়াও সারা দেশে ঐক্য, সংহতি এবং বিধি-ব্যবস্থার অভিন্নতাও প্রয়োজন বাণিজ্যিক অগ্রগতির জন্য। এক এক জমিদারের সম্পর্কে আস্থা স্থাপন করাও কঠিন, আবার এতে ঝামেলাও কম না, জায়গা বদলালেই টাকা বদলাতে হত। সর্বোপরি ছিল জমিদারদের হাজার রকমের ট্যাক্সের বোঝা—নদী পেরোতে ট্যাক্স, রাস্তা পেরোলে ট্যাক্স, ধুলো উড়ে ট্যাক্স, ট্যাক্সের কোন শেষ ছিল না।

এ সমস্ত কারণে বার্গার শ্রেণী এবং তাদের প্রভাবাধীন নগরগুলোর প্রধান চেষ্টা দাঁড়িয়েছিল খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন জমিদারী এলাকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে এক রাষ্ট্র, এক নিয়ম, একই মুদ্রা, একই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য। দেশের রাজার হাত শক্তিশালী করে তার দ্বারা সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে বার্গারশ্রেণী রাজাকে অস্ত্র, সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। এই বার্গারদেরই সহায়তায় ইউরোপের সর্বত্র রাজন্যবর্গের অধীনে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

বারুদের প্রচলন এবং ইউরোপে কামান বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে

www.pathagar.com

এর ব্যাপক ব্যবহার এ রাজশক্তিকে গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। জমিদারদের শক্তিশালী দুর্গগুলি রাজকীয় বাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে একে একে ভেঙে পড়ল। আর এই দুর্গগুলিই ছিল জমিদারদের ক্ষমতার প্রকৃত শক্তি। দুর্গগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে সামরিকভাবে পর্যুদস্ত সামন্ত-প্রভুদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করা রাজার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

ফ্রান্সে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

শার্লামেনের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর ফ্রান্সে মোট চৌদ্দটি সামন্ত রাজ্যের আবির্ভাব হয়। এর মধ্যে ডিউক অব প্যারিসকে নামে ফ্রান্সের রাজা বলে স্বীকার করা হলেও আসলে প্রত্যেকটি সামান্তরাজ্য স্বাধীন অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক সত্তারূপে বিরাজ করতে থাকে। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সেই সামন্তপ্রথা পরিপূর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, ফলে সামন্তপ্রভুদের স্বেচ্ছাচারের পরিপূর্ণ রূপ ফ্রান্সেই দেখা দেয়। প্রতিটি সামন্ত প্রভুর নিজস্ব টাকশালে মুদ্রা প্রস্তুত হত, নিজস্ব আদালতে বিচার কার্য সম্পন্ন হত, নিজস্ব সৈন্যবাহিনী প্রজাপীড়নে ও অন্য সামন্তপ্রভুর উপর হামলায় নিয়োজিত হত। সর্বোপরি রাজার নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে সামন্তপ্রভুরা ইচ্ছামত কৃষকদের উপর শোষণ চালিয়ে যেত। নর্মাণ্ডি, অ্যাকুইটেন, বার্গাণ্ডি, ফ্লাণ্ডার্স, শ্যাম্পেন ও টুলো—প্রত্যেকটির সামন্ত জমিদার ক্ষমতার দিক দিয়ে ছিলেন ফ্রান্সের রাজারও উপরে। এর মধ্যে অর্ধেক আবার ছিলো ইংলণ্ডের রাজার অধীনে। নর্মাণ্ডি, অ্যাকুইটেন প্রভৃতির অধিকারী ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন আইনতঃ ফ্রান্সের রাজার ভ্যাসাল। কিন্তু কার্যত তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান এবং ফ্রান্সের রাজার সবচেয়ে বড় শত্রু। ফ্রান্সের রাজার হাতে ছিল শুধুমাত্র প্যারিস ও অর্লি।

৯৮৭ খৃঃ প্যারিসের ডিউক হিউ ক্যাপেট ক্যাপেসিয়ান রাজবংশের প্রথম নরপতি হিসাবে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এ বংশের নরপতিগণ ফ্রান্সের সামন্তশক্তিকে পরাভূত করে রাজশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। এ বংশের নরপতি ষষ্ঠ লুই নিজের ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সামন্তপ্রভুদের দমন করে এদের অত্যাচারের হাত থেকে বণিক সম্প্রদায়কে বহুলাংশে রক্ষা করেন। ক্যাপেসিয়ান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা

www.pathagar.com

ফিলিপ অগাস্টাস শুধু ফ্রান্সের সামন্ত জমিদারদের হাত থেকে বহু এলাকাই উদ্ধার করেননি। ইংলণ্ডের রাজা জনকে পরাজিত করে নর্ম্যাণ্ডি ও আঞ্জুপ্রদেশ দুটি মুক্ত করে নেন। উদ্ধারকৃত অঞ্চলগুলিতে রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজার নিজস্ব বাহিনী এগুলোর প্রহরায় মোতায়েন হয়।

ফিলিপের পৌত্র নবম লুই পরবর্তী পর্যায়ে ফ্রান্সের সামন্তপ্রভুদের দমন করেন। তার সময়ে ফ্লাণ্ডার্স, ব্রিটানী, গ্যাসকনি, বার্গাণ্ডি প্রভৃতির ডিউক-গণ একত্রে বিদ্রোহ করেন এবং লুই এই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে লুই রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ দেশের সর্বত্র রাজার শাসন প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ফ্রান্সের প্রায় সর্বত্র (ইংলণ্ড অধিকৃত অ্যাকুইটেন ব্যতীত) ফ্রান্সের রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এত বড় দেশ শাসনে প্রায়শ রাজার অর্থের প্রয়োজন হত। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের উপর কর আরোপের উদ্দেশ্যে রাজা এস্টেট্‌স্ জেনারেল (Estates General) নামক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতেন।

যাজক সম্প্রদায়, সামন্তপ্রভু ও অভিজাত বণিকদের দ্বারা গঠিত এই এস্টেটস্ জেনারেল রাজাকে ক্ষুদ্র বণিক ও কৃষকদের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর পরামর্শ দিত। এস্টেট্‌স্ জেনারেল-এর সহায়তায় রাজার অর্থাগমের পথ খুলে যায় এবং রাজশক্তির ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ফ্রান্স ইংলণ্ডের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসে এটা শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৩৩৭—১৪৫৩) নামে পরিচিত। ইংলণ্ডের রাজা ফ্রান্সে তার হারানো জায়গাগুলি উদ্ধারে সচেষ্ট হন। শিল্প সমৃদ্ধ শহর ফ্লাণ্ডার্স-এর দখল নিয়ে উভয় দেশের রাজার মধ্যে নতুন করে বিবাদ শুরু হয়। ফ্রান্সের রাজা ফ্লাণ্ডার্সকে নিজের অধীনে আনতে চেয়ে-ছিলেন, অপরপক্ষে ফ্লাণ্ডার্স-এর বণিকগণ ইংলণ্ডের সাথে বাণিজ্য সূত্রে ঘনিষ্ঠতা থাকার দরুন সে দেশের রাজার কাছ থেকে সমর্থন লাভ করে। এই

www.pathagar.com

কলহ চরমে উপনীত হয় যখন ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড স্বয়ং ফ্রান্সের সিংহাসন দাবী করে বসেন।

যুদ্ধ প্রধানতঃ ফ্রান্সের মাটিতে সংঘটিত হয়। সবদিক দিয়ে দুর্বল ফ্রান্সের সৈন্যদল ইংলণ্ডের সৈন্যদের হাতে নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। প্রথমে ক্রেসি (১৩৪৬) ও পরে পয়তিয়ার্স-এর (১৩৫৬) যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্সের রাজাকে বন্দী করে রাখা হয়। উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ফ্রান্সের এক বিরাট ভূখণ্ড ইংলণ্ড দখল করে নেয়। ফ্রান্সের এই ঘোর দুর্দিনে যুগপৎ ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যদল লুটপাট ও কৃষকদের উপর নির্যাতন শুরু করে। এর উপর শুরু হয় সামন্ত প্রভুদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও অকথ্য অত্যাচার। ফ্রান্সের যুবরাজ চার্লস-এর কাছে তার পিতার মুক্তিপণ হিসাবে প্রচুর অর্থ দাবী করা হয়। প্যারিসের নেতৃত্বে উত্তরের শহরগুলি চার্লস-এর কাছে দাবী জানালো দেশের ক্ষমতা এস্টেটস্ জেনারেল এর কাছে তুলে দেবার। চার্লস তাদের দাবী না মেনে এস্টেট্স্ জেনারেল ভেঙ্গে দিতে অগ্রসর হলে প্যারিসে এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কৃষকদের বিদ্রোহ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত এই কৃষক বিদ্রোহ সারা দেশে ফরাসী সামন্তপ্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। 'জ্যাকুয়ারী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত এই বিদ্রোহ সামন্তপ্রভুদের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করে যে তারা নির্মমভাবে এটা দমন করতে অগ্রসর হয়। জ্যাকুয়ারী বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও এটা ফ্রান্সে ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটাতে বহুলাংশে সমর্থ হয়।

কৃষকবিদ্রোহ দমনের পরে ফরাসী সামন্তপ্রভুরা বহুলাংশে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলে এবং রাজাকে সাহায্য করতেও অগ্রসর হয়; তৎসত্ত্বেও ফ্রান্সের বিরাট অংশ ইংলণ্ডের হাতে ছিল। অর্লি শহরটি তখন ফ্রান্সের সর্বপ্রধান সামরিক ঘাঁটি। ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ শহর প্রায় ২০০ দিন প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ফ্রান্সের এই গভীর সংকটের দিনে কৃষককন্যা জোয়ান অব আর্ক রাজার অনুমতি নিয়ে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে এলেন। জোয়ান তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও তেজস্বী মনোভাবের দ্বারা ভেঙ্গে পড়া সৈন্যদের মনোবল দৃঢ় করতে সক্ষম হলেন। জোয়ানের বীরত্বে মুগ্ধ ফরাসী সৈন্যরা তাঁর নেতৃত্বে অগ্রসর হল অর্লি শহর মুক্ত করতে। কিন্তু সামান্য কৃষককন্যার এতখানি কৃতিত্ব সহ্য হল না সামন্ত প্রভুদের। ইংরেজের

www.pathagar.com

পরম বন্ধু বার্গাণ্ডির ফরাসী ডিউকের হাতে বন্দী হলেন জোয়ান। তাঁকে তুলে দেয়া হল ইংরেজদের হাতে। সে যুগের সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে যা পরিগণিত ছিল—সেই মারাত্মক ডাইনি অপরাধে অভিযুক্ত করে জোয়ানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। জোয়ানের মৃত্যু হল নৃশংসভাবে, কিন্তু কৃষক কন্যা জোয়ান অব আর্ক পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের নির্যাতিত মুক্তি সংগ্রামী জনগণের কাছে আদর্শের প্রতীকরূপে পরিগণিত হলেন।

জোয়ানের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি। ফ্রান্সের জনগণ অলি শহর মুক্ত করে ক্রমশঃ ইংরেজদের নর্ম্যাণ্ডি থেকেও অপসারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত প্যারিস শহরও শত্রুমুক্ত হয়।

১৪৫৩ সালে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুধুমাত্র ক্যালে বন্দর ছাড়া সমগ্র ফ্রান্স ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হয়।

ইংলণ্ডের হাত থেকে ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চল মুক্ত হওয়ার পরে দেশের একত্রীকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হতে থাকে। পরবর্তী রাজা একাদশ লুই তাঁর প্রধান শত্রু বার্গ্যাণ্ডির ডিউককে পরাজিত করে প্রদেশটি দখল করেন। লুই-এর বংশধরগণ সবশেষে ব্রিটানী প্রদেশটিও দখল করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে ফ্রান্সের একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়।

একত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের রাজশক্তি পরিপূর্ণ ক্ষমতা লাভ করে। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ফ্রান্সের অসংগঠিত, সামন্ততান্ত্রিক সৈন্যদলের পরিবর্তে একটি সংগঠিত, সুশৃঙ্খল স্থায়ী সৈন্যদল গড়ে তোলা হয়। এদের বেতন দেয়া হত রাজকোষ থেকে। এদের ভরণ পোষণের জন্য জনগণের উপর বার্ষিক কর আরোপ করা হয়। এস্টেট্স্ জেনারেল-এর সভা আহ্বানের পরিবর্তে রাজা বেতনভোগী কর্মচারীদের দ্বারা রাজ্যশাসন করতে শুরু করেন।

এরপর থেকে সামন্তপ্রভুদের সাহায্য ছাড়াই রাজা নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করতেন ও সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার ফলে বণিকদের তৎপরতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রাজার আনুকূল্যে প্রতি-পালিত বণিকগণ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দেশের বাণিজ্যিক নৌবহর তৈরী হয় এবং ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

ইংল্যাণ্ডে রাজশক্তির অভ্যুদয়

বিভিন্ন বর্বর জাতি যখন পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ করতে শুরু করে, তখন তাদের কয়েকটি শাখা যেমন—এ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, কেল্ট প্রভৃতিরা রোমান অধিকৃত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়। এ্যাঙ্গলদের নাম থেকেই এই দ্বীপের নাম হয় ইংলণ্ড। নবম শতাব্দীতে ইংলণ্ডের খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত রাজ্যগুলির উৎপত্তি ঘটতে থাকে।

একাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের নর্ম্যাণ্ডি প্রদেশের ডিউক প্রথম উইলিয়াম ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। ১০৬৬ খৃঃ হেষ্টিংস-এর যুদ্ধে তিনি সর্বশেষ এ্যাংলো স্যাক্সন রাজা এডোয়ার্ডকে পরাজিত করে ইংলণ্ড দখল করে নেন। উইলিয়াম নর্মান বংশোদ্ভূত ছিলেন বলে এ বিজয়কে নর্মান বিজয় বলা হয়। যদিও সমগ্র ইংলণ্ড পরিপূর্ণভাবে অধিকার করতে উইলিয়ামের বেশ কয়েক বছর সময় লাগে, তবুও এ সময়ের মধ্যে উইলিয়াম তাঁর বিশ্বস্ত নর্ম্যান অনুচর ও সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে বিজিত অঞ্চলের জমিগুলি বিতরণ করে দেন। সামন্ত-প্রথা পরিপূর্ণভাবে ইংলণ্ডে শিকড় গেড়ে বসে নর্ম্যান বিজয়ের পরেই। বিজিত রাজ্যকে পরিপূর্ণভাবে দখলে রাখার জন্য উইলিয়াম রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ কারণে তিনি শুধু তার নিজের সামন্ত ভ্যাসালদেরই নয়, তাদের অধস্তন ভ্যাসালদের কাছ থেকেও শপথ আদায় করিয়ে নেন। 'স্যালিসব্যারীর শপথ' নামে পরিচিত এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সকল সামন্ত জমিদারগণ রাজাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই উইলিয়াম রাজার প্রতি সামন্তপ্রভুদের আচরণ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। কাজেই ভবিষ্যতে সামন্ত জমিদারগণ যাতে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ না পায় সেজন্য তিনি তাদের বিক্ষিপ্তভাবে জমি বিতরণ করেন। একই সামন্তপ্রভুর জমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকার দরুন তার পক্ষে সংগঠিত সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে রাজা নিজেও সমগ্র দেশের এক সপ্তমাংশ জমির মালিক হন। মিলিতভাবে রাজা ও সামন্তপ্রভুগণ কৃষকদের উপর সামন্তশোষণ শুরু করেন। স্বাধীন কৃষকদেরও ভূমিদাসে পরিণত করা হল। মেটায়েজ, বেনালাইটিস, প্রেষ্টেশনস, কর্ভি প্রভৃতি নির্যাতন মূলক কর আরোপ করা হল কৃষকদের উপর। তা সত্ত্বেও ইউরোপের সামন্তপ্রথার সাথে একটি বিশেষ পার্থক্য

www.pathagar.com

ছিল ইংলণ্ডে প্রবর্তিত সামন্তপ্রথার। তা হল, রাজশক্তির ক্ষমতা অধিক থাকার দরুন সামন্তপ্রভুরা কখনই বিশেষ ক্ষমতা সঞ্চয় করতে পারেনি। উইলিয়ামের উত্তরাধিকারি ষ্টিফেনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামন্তপ্রভুরা দেশকে সাময়িকভাবে অরাজকতার মুখে নিক্ষেপ করলেও, পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় হেনরী আবার তাদের শক্তহাতে দমন করেন। ষ্টিফেনের সময়ে তৈরী সামন্তপ্রভুদের দুর্গগুলিকে হেনরী ভেঙ্গে দেন। তিনি দেশের সর্বত্র রাজার প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন সামন্তপ্রভুদের আদালতের স্থলে রাজ আদালত স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের আইন প্রয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সর্বত্র রাজার আইন প্রচলন করা হল।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইংলণ্ডে শহরগুলির উৎপত্তি শুরু হয়। প্রথম উইলিয়ামের সময়ে শহরের সংখ্যা ছিল ৮০টি, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এগুলির সংখ্যা উন্নীত হয় ১৬০টিতে। লণ্ডন প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। বেশীর ভাগ শহর রাজার নিজস্ব এলাকায় গড়ে ওঠে। যদিও রাজা এ শহরগুলির কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতেন তথাপি তারা রাজাকেই সমর্থন করে কারণ সামন্তপ্রভুদের শোষণ তাদের কাছে ছিল আরও ভয়াবহ। অনেক সামন্তপ্রভুর বদলে একজন রাজাকেই তারা অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করত।

দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র জনের রাজত্বকালে সামন্তপ্রভুরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রুসেডের দরুন সামন্তপ্রভুদের উপর কর বৃদ্ধি এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাষ্টাসের কাছে রাজা জনের পরাজয় প্রভৃতি কারণে সামন্ত-প্রভুরা রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়। তারা রাজাকে দিয়ে বলপূর্বক ম্যাগনা-কার্টা (১২১৫) নামক দলিলে সই করিয়ে নেয়। ম্যাগনা কার্টায় সামন্ত-প্রভুদের কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত হয়। যদিও এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি সামন্ত দলিল, তথাপি পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের ইতিহাসে সংঘটিত রাজা ও পার্লামেন্টের সংঘর্ষে ম্যাগনা কার্টাকে ইংলণ্ডের জনগণের অধিকারের সনদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এতে রাজার ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করার ফলে পরবর্তীকালে রাজার ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে ম্যাগনা কার্টায় বর্ণিত ধারাগুলির উদ্ধৃতি দেয়া হত।

রাজার বিরুদ্ধে সামন্তপ্রভুদের শক্তি সঞ্চয় কৃষকদের উপর সামন্ত নির্যাতন আরও বাড়িয়ে দেয়। এই নির্যাতন ও শোষণ এক পর্যায়ে এতদূর পৌঁছায়

www.pathagar.com

যে শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইংলণ্ডে ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াট টাইলর-এর নেতৃত্বে সংঘটিত এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই বিদ্রোহ দমিত হলেও এর পরিণতি স্বরূপ ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে সার্ফরা মুক্তি লাভ করে।

অন্যদিকে সামন্তপ্রভুরা রাজার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে শুরু করে। ১২৬৫খৃঃ প্রথম ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট-এর অধিবেশন ডাকা হয়। সাইমন ডি মন্টফোর্ডের নেতৃত্বে এই পার্লামেন্ট রাজা তৃতীয় হেনরীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়! যাজক ও সামন্তপ্রভুদের দ্বারা গঠিত এই পার্লামেন্টে এখন থেকে বণিক সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী রাজা প্রথম এডোয়ার্ড ব্যক্তিগতভাবে সাইমনের বিরোধিতা করলেও সাইমন প্রস্তাবিত পার্লামেন্টের অনুসারী ছিলেন। তাঁর সময়ে গঠিত 'মডেল পার্লামেন্ট'-এর উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রভুদের উপর রাজার নির্ভরশীলতা কমানো; এজন্য তিনি বণিকদের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকতর সুযোগ দেন। পরবর্তী রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময়েই পার্লামেন্ট 'হাউস অব লর্ডস' ও 'হাউস অব কমন্স' এই দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়। রাজার কর ধার্য করার ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ছাড়াও পার্লামেন্ট এখন থেকে দেশের একমাত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় পরিণত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইংলণ্ডে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, শহরগুলির সমৃদ্ধি, মুদ্রার ব্যবহার, শ্রমশক্তির অভাব--প্রভৃতি কারণে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয় এবং ম্যানর প্রথা ভাঙ্গতে শুরু করে।

অন্যদিকে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সমাপ্তির ফলে ফ্রান্স থেকে প্রত্যাগত ইংরেজ সামন্তপ্রভু ও তাদের সৈন্যদল দেশে ভয়ঙ্কর অরাজকতার সৃষ্টি করে। যুদ্ধ সমাপ্তির দুই বছরের মধ্যে ইংলণ্ড একটি মারাত্মক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইতিহাসে এটা গোলাপের যুদ্ধ (১৪৫৫) নামে পরিচিত। সাদা ও লাল গোলাপের প্রতীক চিহ্ন নিয়ে 'হাউস অব ইয়র্ক' ও 'হাউস অব ল্যাঙ্কাস্টার' নামে দুই দল ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন দখল করার উদ্দেশ্যে এই মারাত্মক ধ্বংস-যজ্ঞে লিপ্ত হয়। ত্রিশ বছর পরে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধে বহু সামন্তপ্রভু সবংশে নিহত হয়। এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ইংলণ্ডে সামন্ত-প্রথার উপর প্রবল আঘাত হানে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জনগণ একটি শক্তিশালী

www.pathagar.com

রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভব করে। সেই সুযোগে হেনরী টিউডর (সপ্তম হেনরী নামে পরিচিত) সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৮৫) এবং নতুন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম হেনরীর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ টিউডর বংশ নামে পরিচিত।

নবোদ্ভূত বণিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় হেনরী সামন্ত প্রভুদের উপর শেষ আঘাত হানেন। সামন্তপ্রভুদের দুর্গগুলি কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়া হয় এবং সামন্ত সৈন্যদল ভেঙ্গে ফেলা হয়। বহু সংখ্যক সামন্ত জমিদার—যারা রাজার শাসন মানতে অস্বীকার করে—মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের জমিদারী রাজার অধীনে আনা হয়।

ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী সুসংগঠিত ছিল। শহরের বণিকরা ছাড়াও সদ্যমুক্ত কৃষকসম্প্রদায় দলে দলে রাজার সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করে রাজশক্তি বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে ইংলণ্ডের সামন্ত জমিদারদের অধিকাংশ এখন নিজেরাই বণিকশ্রেণীতে পরিণত হয়। ম্যানর ভেঙ্গে দিয়ে সেখান থেকে কৃষকদের ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করে সামন্তপ্রভুরা বেড়া দিয়ে ঘিরে (**Enclosure**) সেগুলিকে পশুচারণ ক্ষেত্রে পরিণত করে। বিশেষ করে মেষচারণ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে এবং তারা এখন ফ্লাণ্ডার্স ও ইতালীর বিভিন্ন শহরে পশম রপ্তানী করে বিশেষ অর্থশালী হয়ে ওঠে। এই নবোদ্ভূত সামন্ত তথা বণিক সম্প্রদায় সর্বপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও ব্যবসা বাণিজ্যকেই তাদের প্রধান পেশায় পরিণত করে এবং সামন্তপ্রথার পরিবর্তে ইংলণ্ডে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ সুগম করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ছোটবড় আরও কয়েকটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলেই এটা সম্ভব হয়। পশ্চিমে শক্তিশালী স্পেনীয় রাজ্যের উৎপত্তি হয়, উত্তরে ডেনমার্ক নরওয়ে ও সুইডেন জাতীয় রাষ্ট্ররূপ আবির্ভূত হয়—এবং পূর্বে পোলাণ্ড, বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরী রাজ্য মাস্কভির আবির্ভাব ঘটে। স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলি নিজ নিজ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়।

www.pathagar.com

ইতালী ও জার্মানীর রাজনৈতিক অনৈক্য

মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান দেশেই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটলেও ইতালী ও জার্মানীতে এর ব্যতিক্রম দেখা দেয়।

ইতালী দশম শতাব্দী থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। প্রাচীন রোমের বাণিজ্য পথগুলি ব্যবহার করেই ইতালী দু' এক শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ইতালীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যবন্দর জেনোয়া, ভেনিস, পীসা ও ফ্লোরেন্স-এর নাবিকগণ প্রাচ্যদেশগুলি থেকে সোনা, হাতির দাঁতের তৈরী দ্রব্যাদি, ব্রোকেড ও সুগন্ধি দ্রব্য কিনে নিয়ে পশ্চিমের দেশগুলির নিকট বিক্রী করত। ক্রুসেডের মাধ্যমে ইতালীর ব্যবসা বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পথগুলি হস্তগত হওয়ার ফলে ইতালীর বণিকগণ প্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের পুরোটাই দখল করে। ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ইতালীর ব্যবসায়ীদের শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করে; ফলে বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য যেমন কাঁচ শিল্প, ধাতুশিল্প, পশম ও রেশম শিল্পের উৎপত্তি ঘটে। ইতালীতে ধনতন্ত্রের উন্মেষের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

রাজনৈতিকভাবে ইতালীতে এককেন্দ্রিক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মত বণিকশ্রেণীর সাহায্যে এখানে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা ঘটেনি। তার কারণ হল: প্রথমত, ইতালীর বিভিন্ন বাণিজ্য বন্দরগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সব সময়েই লেগে থাকত। প্রাচ্যদেশগুলি থেকে ক্রীত বিলাস দ্রব্যাদির বাজার ইতালীতে বিশেষ ছিল না। ইতালীর নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না সে সব দ্রব্য ক্রয় করা। পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত প্রভুরাই ছিল ঐসব দ্রব্যের একমাত্র ক্রেতা। এর ফলে প্রাচ্যের বণিকদের কাছ থেকে বিলাসদ্রব্য কেনা এবং সেগুলো নিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে বিক্রী করে দিত। ইতালীর বিভিন্ন নগর রাষ্ট্র যথা ভেনিস, জেনোয়া, পীসা ও ফ্লোরেন্সের মধ্যে এই মাল বেচাকেনা নিয়ে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। এহেন অবস্থায় ইতালীতে এমন কেউ ছিলেন না যিনি সে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং নগরগুলিকে একত্রিত করতে পারেন। একমাত্র ক্ষমতাশালী

www.pathagar.com

ছিলেন রোমের পোপ যিনি সকলের কাছেই ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু তিনি সদাই আতঙ্কে দিন কাটাতেন পাছে কোন সামন্ত প্রভু প্রভাবশালী হয়ে তাঁর উপর খবরদারী শুরু করেন। কাজেই সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যে দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারতেন তা না করার ফলে ইতালী একটি জাতীয় রাষ্ট্র রূপে গড়ে উঠতে পারলই না উপরন্তু উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়ে রইল। মধ্যযুগে শার্লামেনই মোটামুটি ইতালীকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই ইতালী পুনরায় খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তরে পুরাতন লম্বার্ড রাজ্য, মধ্যে পোপের রাজ্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রিন্সিপালিটিগুলি। দক্ষিণের অংশ ভাগাভাগি হয়ে যায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও মুসলিম সারাসিনদের মধ্যে। এছাড়া ছিল স্বাধীন স্বতন্ত্র নগরগুলি যেমন জেনোয়া, ভেনিস, পীসা ও ফ্লোরেন্স।

ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ইতালীর ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নর্মানদের আক্রমণ। ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি রাজ্য থেকে আগত দুজন নর্মান নাইট ভ্রাতৃদ্বয় রবার্ট জিসকার্ড ও রজার জিসকার্ড ইতালীর দক্ষিণে নেপ্‌ল্‌স রাজ্য ও সিসিলি দ্বীপ দখল করে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ১১২৭ খ্রীঃ এই দুইটি রাজ্য একত্রিত হয়ে গড়ে ওঠে নেপ্‌ল্‌স ও সিসিলি রাজ্য।

নর্মানদের অধীনস্থ নেপ্‌ল্‌স ও সিসিলি রাজ্য একটি সুশাসিত রাজ্যরূপে গড়ে উঠে। একদল সুযোগ্য রাজকর্মচারীদের সহযোগিতায় সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি কেন্দ্রীয় সরকার। করের বোঝা মোটামুটি সহনশীল ছিল এবং রাজকীয় সেনাবাহিনীর একটি দল সার্বক্ষণিকভাবে তৈরী থাকত দেশরক্ষার জন্য। এক কথায় নেপলস-সিসিলি রাজ্যটিকে ইউরোপের প্রথম আধুনিক রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। নর্মানগণ যখন নেপ্‌লস-সিসিলিতে আধুনিক রাষ্ট্রের পত্তন করছিল ঠিক একই সময়ে তারা ইংলণ্ডে একই ধরনের রাজ্য গড়ে তুলছিল। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে তারা নেপ্‌লস-সিসিলিতে একটি পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করে যাকে অনুকরণ করেই ১২৯৫ খ্রীষ্টব্দে ইংলণ্ডের মডেল পার্লামেন্ট গড়ে তোলা হয়।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় নেপলস-সিসিলি রাজ্যটি খৃষ্টান, গ্রীক সারাসিন ও নর্মানদের মিশ্র সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

এর শাসক দ্বিতীয় ফ্রেডারিক-এর শাসনকালে এ রাজ্যটি একটি উচ্চ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতদের সম্মিলন ঘটে এ রাজ্যটিতে। একজন সুদক্ষ সংস্কৃতিবান শাসকের কেন্দ্রীয় শাসনে শাসিত নেপলস-সিসিলি রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যত ইতালীতে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সুন্দর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি। বরং রাজ্যটি সম্রাট ও পোপের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পবিত্র রোমান সম্রাট ষষ্ঠ হেনরী সিসিলির কনষ্টান্সকে বিবাহ করার পরে তাঁদের দুজনের সন্তান ফ্রেডারিক একই সঙ্গে নেপলস-সিসিলির রাজা ও পবিত্র রোমান সম্রাট রূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। স্বভাবতঃই তিনি পোপের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পোপ প্রতিহিংসা বশে তাঁর রাজ্যটি আক্রমণ করার জন্য ফ্রান্সের অ্যাঞ্জু প্রদেশের ডিউককে আমন্ত্রণ জানান।

নেপলস-সিসিলির এর পরের ইতিহাস অ্যাঞ্জেভিনদের ইতিহাস। অ্যাঞ্জেভিন শাসকগণ অবশ্য নেপলস-সিসিলি রাজ্যে নিদারুণভাবে অজনপ্রিয় ছিলেন। সিসিলিতে অ্যাঞ্জেভিন কাউণ্টগণ ও তাঁদের অধীনস্থ ফরাসী সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বিশেষভাবে প্রতিরোধপ্রাপ্ত হন। অবশেষে ১২৮২ খ্রীস্টাব্দের এক সন্ধ্যায় সিসিলিবাসীগণ অকস্মাৎ এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং সকল ফরাসী নাগরিককে হত্যা করে। ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা 'সিসিলীয় সন্ধ্যা' নামে পরিচিত। এই অভ্যুত্থানের পর সিসিলির সিংহাসন শেষ পর্যন্ত স্পেনের অ্যারাগণ প্রদেশের পিটার কর্তৃক অধিকৃত হয়। তিনি জার্মানীর হহেনষ্টাউফেন রাজবংশে বিবাহ করেন। ফলে এখন থেকে সিসিলি স্পেনের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায় এবং নেপলস স্বতন্ত্রভাবে ফরাসী শাসনাধীনে থাকে। ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে অ্যারাগণের রাজা অ্যালফনসো নেপলস জয় করেন। ফলে নেপলস-সিসিলি রাজ্যদুটি পুনরায় একত্রীত হয়। কিন্তু এই একত্রীকরণ ইতালীর দক্ষিণাঞ্চলের এই দুটি রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য মোটেও শান্তি ডেকে আনেনি কারণ এদের বিদেশী শাসকগণ ইউরোপে তাদের রাজ্য দখলের অভিপ্রায়ে প্রায় প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন।

নেপ্লস-সিসিলির ভাগ্য যখন এরূপ তখন ইটালীর অন্যান্য রাজ্য-গুলি বিশেষতঃ উদীয়মান নগর রাষ্ট্রসমূহের উপর চলছিল জার্মানীর

www.pathagar.com

পবিত্র রোমান সম্রাটদের আক্রমণ। এই প্রথম বারের মত দেখা গেল ইতালীর নগর রাষ্ট্রগুলিকে পোপের নেতৃত্বাধীনে লম্বার্ড লীগের পতাকা-তলে সমবেত হতে। শেষ পর্যন্ত ইতালীর রাজ্যগুলি মিলিতভাবে জার্মানীকে পরাজিত করে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু এ একতা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। একটি সম্মিলিত ইতালীর জাতীয় শক্তির অভ্যুদয়ের পরিবর্তে আবার জেগে ওঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং নগর রাষ্ট্র। এরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের অভিপ্রায়ে নিরন্তর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত।

ইতালীর নগররাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সবচেয়ে বেশী। ভেনিস, জেনোয়া, পীসা, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি নগরগুলির বাণিজ্য প্রতিযোগিতা অনেক সময়েই সামরিক সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করত। নগর রাষ্ট্রগুলি অনেকটা প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলির মতই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন। এদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল কতকগুলি বণিক পরিবারের হাতে। এরা একজন অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতায় বসাতেন এবং তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। অনেক সময় কয়েকটি পরিবার একার্থে পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতেন। তারা ক্ষমতার অন্তরালে বসে ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে লিপ্ত থাকতেন। এ ক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগ, গুপ্তহত্যা এমনকি গৃহযুদ্ধের ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের থেকে সংগৃহীত ভাড়াটে সৈন্যদের এ কাজের জন্য নিয়োগ করা হত।

এমন একটি সৈন্যদলের নেতা ছিলেন একজন ইংরেজ, স্যার জন হকউড; 'হোয়াইট কোম্পানী' নামে পরিচিত তাঁর সৈন্যদল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইতালীর রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ইতালীর নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভেনিসকে বলা যেতে পারে নগর রাষ্ট্রগুলির মুক্তা বা মধ্যমণি। এটা ছিল দৃশ্যতঃ একটি প্রজাতন্ত্র কিন্তু কার্যতঃ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তির হাতে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিসের অধীনে ছিল তিন হাজার পণ্যবাহী জাহাজ। এদের প্রহরা দিত বিশাল নৌবাহিনী।

www.pathagar.com

বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি সাধন ও বিপুল ধন-সম্পদ করায়ত্ত করার ফলে ভেনিস ইতালী তথা ইউরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়েছিল।

এর পরবর্তী নগর রাষ্ট্র হিসাবে মিলান ও ফ্লোরেন্সের নাম করা যেতে পারে। মিলানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল ভিসকন্তি পরিবার। এই দুই পরিবারই ছিল স্বৈরাচারী শাসক। তথাপি শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে এদের উভয়েরই খ্যাতি ছিল। ফ্লোরেন্সের অধিকর্তা লরেঞ্জো ডি মেডিসির (১৪৭৮-১৪৯২ খৃঃ) শাসনকালে ফ্লোরেন্স রেনেসাঁ যুগের সর্বোচ্চ শিল্পচর্চা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ইতালীর ভাগ্যে নেমে আসে আরো দুর্ভোগ। ইতালীর সমৃদ্ধি, অর্থ, তার রুচিবোধ, তার শিল্পের বিকাশ সব কিছুই প্রতিবেশী দেশগুলির বিশেষত ফ্রান্সের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রান্সের শাসকদের অধীনে ছিল একটা গোটা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র। তাঁরা আক্রমণ করলেন ইতালীকে। ইতালী তখন আভ্যন্তরীণ বিরোধে ক্ষত-বিক্ষত, বাইরের হস্তক্ষেপ রোধ করার মত কোন সুযোগ্য নেতৃত্ব সেখানে ছিল না। বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ অবশ্য এ বিপদ অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দান্তে বা পেট্রার্ক-এর মত মনীষীদের সতর্কবাণীতে কেউ কান দেয় নি। কেউ এগিয়ে আসেনি এই বিবদমান রাজ্যগুলির বিরোধ থামিয়ে তাদের একত্রিত করার মহান উদ্যোগ নিয়ে। এর পরিণাম হল ভয়াবহ। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লস নেপ্‌ল্‌স-এর সিংহাসন দাবী করে ইতালী আক্রমণ করে বসলেন। এরপর থেকে ইতালীর বিরাট অঞ্চলে ফরাসী কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইতালীতে স্পেনীয় রাজশক্তির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইতালীর উপর আধিপত্য বিস্তার ও শাসন প্রতিষ্ঠা করে অষ্ট্রিয়ার রাজশক্তি। একক রাজ্যের অধীনে ইতালীর একত্রীকরণের কাজ শুরু হয় অনেক পরে,—কেবলমাত্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে।

www.pathagar.com

জার্মানীর রাজনৈতিক অনৈক্য

৯১১ খৃষ্টাব্দে জার্মান ভূখণ্ডে ক্যারোলিঞ্জিয়ান রাজবংশের অবলুপ্তি ঘটার পর জার্মানরা তাদের পূর্বপুরুষের অনুসৃত নির্বাচিত রাজতন্ত্রের পদ্ধতি গ্রহণ করে। দশম শতাব্দীতে জার্মানীর মূল সামন্ত রাজ্য ছিল পাঁচটি ; ফ্রাঙ্কোনিয়া, স্যাক্সনী, থুরিঞ্জিয়া, সয়াবিয়া ও ব্যাভারিয়া।

জার্মানদের প্রথম নির্বাচিত রাজা ছিলেন ফ্রাঙ্কোনিয়ার ডিউক কনরাড। এর পরে রাজা নির্বাচিত হলেন স্যাক্সনীর ডিউক হেনরী। হেনরীর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রথম অটো জার্মানীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। অটোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক বেশী। তিনি শুধু জার্মানীর রাজা হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল শার্লামেনের মত বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে ইতালীর দিকে হাত বাড়ালেন। ইতালীর তাৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে সে সুযোগ এনে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি পোপকে বাধ্য করলেন তাঁকে রোমান সম্রাট রূপে অভিষিক্ত করতে। অটোর রাজ্য শুধুমাত্র ইতালী ও জার্মানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জার্মানীর সিংহাসন অধিকৃত হল হহেনষ্টাউফেন রাজবংশের দ্বারা। এ রাজবংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ছিলেন ফ্রেডারিক বারবারোসা। তিনি তাঁর রাজ্যটির নাম দিয়েছিলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। তিনি ও তাঁর পরবর্তী জার্মান শাসকগণ সুদূর ইতালীতে গিয়ে পোপের দ্বারা রোমান সম্রাট রূপে অভিষিক্ত হতেন। তিনিও অটোর মত ইতালীতে অভিযান প্রেরণ করেন। তবে তাঁর আক্রমণের কালে ইতালীর প্রায় সব কয়টি রাজ্য পোপের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে তাঁকে বাধা দেয়। দুইবার তিনি ইতালী আক্রমণ করেছিলেন। দুই বারই তিনি পরাজিত হন।

এই বংশের পরবর্তী বিখ্যাত শাসক ছিলেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তিনিও তাঁর পূর্বপুরুষের মত বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তবে তাঁর পরিকল্পনা ছিল তাঁর মূল ঘাঁটি অর্থাৎ সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে

www.pathagar.com

তাঁর শক্তি সুসংবদ্ধ করা এবং সেখান থেকে সমগ্র ইতালীতে আক্রমণ পরিচালনা করা। সে উদ্দেশ্যে তিনি সিসিলিতে তাঁর রাজশক্তিকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করার প্রয়াস পান। সেখানকার সামন্ত শাসনের সকল শক্তিকে তিনি উৎখাত করেন। ইংলণ্ডের রাজা বিজয়ী উইলিয়ামের মত তিনি পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল সামন্ত-ভূস্বামীকে দিয়ে রাজানুগত্যের শপথ করিয়ে নেন। তিনি একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং প্রজাদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করেন। সামন্তরাজাদের আদালতগুলি বাতিল করে তিনি নিজে দেশের সর্বত্র বিচারকদের নিযুক্ত করেন যাতে তাঁরা সারাদেশব্যাপী একই ধরনের আইনের প্রয়োগ ও আদালত স্থাপনের সুযোগ লাভ করেন।

তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের উপর প্রত্যক্ষ সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। মুদ্রা লেনদেন এবং শস্য, বস্ত্র ও আন্যান্য দ্রব্যাদির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। এত ধরনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা সত্ত্বেও ফ্রেডারিকের শাসনব্যবস্থা তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এর মূল কারণ এই যে তিনি ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজাদের মত বার্গার বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর সমর্থন লাভের চেষ্টা করেননি। অধিকন্তু তাঁর ইতালীয় অভিযানও তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। পোপের নেতৃত্বে ইতালীয়রা তাঁকেও বাধা দান করে। তাঁর মৃত্যুর পর পোপ ইতালীতে হহেনষ্টাউফেন বংশের শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলতে অগ্রসর হন। জার্মানীতে হহেনষ্টাউফেন রাজবংশের পরে পবিত্র রোমান সম্রাটের সিংহাসন ও রাজমুকুট অষ্ট্রীয়ার হ্যাপ্‌স্‌বার্গ (Hapsburg) রাজবংশের হাতে চলে যায়। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে এ রাজবংশের রুডলফ হ্যাপস-বার্গ সম্রাটদের মধ্যে প্রথম পবিত্র রোমান সম্রাট নির্বাচিত হন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা নেপোলিয়ন কর্তৃক এই রাজপদটি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল পবিত্র রোমান সম্রাটই ছিলেন অষ্ট্রিয়ার রাজবংশোদ্ভূত।

দীর্ঘদিন যাবৎ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা শাসিত হলেও জার্মানীতে প্রকৃতপক্ষে কোন কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি যার ফলে জার্মানি দেশটি ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের মত এককেন্দ্রিক রাজ্য রূপে গড়ে উঠতে পারেনি

www.pathagar.com

রাজ্য হিসাবে জার্মানীর মূল কাঠামোর দুর্বলতাই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। জার্মানী ছিল বিভিন্ন জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত কতকগুলি সামন্তরাজ্যের সমষ্টি। এর মধ্যে ছিল জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, লিথুয়ানীয়, ফিন ও স্লাভ জাতির মিশ্রণ, এরা প্রত্যেকেই ছিল নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী। অন্যদিকে জার্মান সামন্তরাজাগণ নিজস্ব ধর্ম, পথ ও মতে এতখানি দৃঢ় ছিলেন যে তারা কেবল ক্রমাগত চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন যাতে একটি এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই গড়ে উঠতে না পারে। পবিত্র রোমান সম্রাট নামে সম্রাট হলেও কোন সুদৃঢ় ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন নাম ও পদ-সর্বস্ব এমন একজন দুর্বল শাসক যিনি ছিলেন তাঁর নিজের সামন্ত ভ্যাসালদের দ্বারা অনুগৃহীত। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শহরগুলির তুলনায় জার্মান শহরগুলির উৎপত্তি হয়েছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে। এ শহরগুলি গড়ে উঠেছিল বাল্টিক সাগর ও জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবাহিত নদীগুলির তীরে। পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সাথে তাদের বাণিজ্য চলত জোটবদ্ধ হয়ে। এ জোটের নাম হেনসিয়াটিক লীগ। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে লীগের সদস্যদের কোন যোগ ছিল না। তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল কিভাবে সামন্ত নাইটদের আক্রমণ থেকে তাদের ব্যবসাকে রক্ষা করা যায়। এজন্য তারা নিজস্ব সামরিক বাহিনীও গড়ে তুলেছিল। তবে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মত জার্মান বণিকগণ পবিত্র রোমান সম্রাট বা অন্য কোন রাজার অধীনে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে সামন্ত প্রভুদের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেননি। পবিত্র রোমান সম্রাট বা অন্য কোন জার্মান রাজাও বণিকদের সমর্থন নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে কোন আগ্রহ দেখাননি। ফলে ইতালীর মত জার্মানীও রইল বেশ কয়েক শতক ধরে বহুখণ্ডে বিভক্ত দুর্বল সামন্ত শাসিত একটি দেশ হয়ে, যেখানে বহুকাল পর্যন্ত পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার কোন সুযোগই পেল না। জার্মানীর একত্রীকরণের পর্বটি সমাপ্ত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রুশিয়ার রাজা কাইজারের অধীনে এবং এই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর অসাধারণ গুণসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী বিস্‌মার্ক।

www.pathagar.com

কিন্তু তার আগে অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভে জার্মানীতে প্রবল প্রতাপ ছিল সামন্ত ভূস্বামীদের। ইউরোপের আর কোন দেশে সামন্ত প্রভুদের স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা এতখানি সীমা ছাড়িয়ে যায় নি। জার্মান রাজা কর্তৃক ইতালী ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত সামরিক অভিযানগুলিও মূলতঃ সামন্ত প্রভুদের সীমাহীন লোভ ও বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

আমরা আগেই দেখেছি যে দশম শতাব্দী থেকে জার্মান রাজারা ইতালীতে সামরিক অভিযান পরিচালনা আরম্ভ করেছিলেন। ইতালী ছিল জার্মানীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ দেশ। সুসংবদ্ধ অভিযান ও লুঠ-তরাজের মাধ্যমে জার্মান সামন্ত ভূস্বামীরা নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্রমশ শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে যখন ইতালীর নগরগুলি জার্মান আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে তখন থেকে জার্মান সামন্ত প্রভুরা ইতালীকে ছেড়ে ইউরোপের পূর্ব দিকের দেশগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

সামন্ত নাইটদের পূর্ব ইউরোপের প্রথম অভিযান শুরু হয় লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে। সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের নির্মূল করে জার্মান সেনাদল পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হয়ে বাল্টিক সাগরের পূর্বতীরবর্তী এস্তোনিয়া ও লাটভিয়া দখল করে নেয়। খৃষ্টধর্ম প্রচারের নামে (যদিও এসব অঞ্চলের অধিকাংশ জনগণ বহুপূর্বেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল) সামন্ত দস্যুদের অত্যাচার নিষ্ঠুরতার সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় কিভাবে জার্মান সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম লুট করেছে শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কি নৃশংসভাবে হত্যা করেছে নারী পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে। জার্মানদের অপ্রতিহত অভিযান প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় রুশদের হাতে যখন তারা রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। ১২৪২ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার নেভস্কি লেক পেইপাসের নিকট তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। দুশ' বছর পর ১৪১০ খৃষ্টাব্দে পোল, লিথুয়ানিয়া ও রুশদের সম্মিলিত বাহিনী পূর্ব প্রাশিয়ার গ্রুনওয়াল্ড-এর

www.pathagar.com

নিকট জার্মান সেনাদলকে আর একবার পরাজিত করে। এর পর থেকেই শুধুমাত্র জার্মানদের পূর্ব অভিযানের সমাপ্তি ঘটে।

জার্মানদের সামরিক অভিযান কেবল তাদের অধিকৃত দেশগুলির জন্যই ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনেনি, স্বয়ং জার্মানীর জন্যও এ অভিযান সৃষ্টি করেছিল মারাত্মক ক্ষত। ইতালী ও পূর্ব দেশগুলি থেকে লুটের মাধ্যমে ধনসম্পদ আহরণ এবং পূর্ব ইউরোপের কতকাংশের দখল (যা পরবর্তী-কালে পূর্ব প্রাশিয়া নামে পরিচিত হয়েছিল) জার্মানীর সম্রাটের শাসনকেই শুধু দুর্বল করে তোলেনি, ভবিষ্যতে জার্মানীতে কোন রকম রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে একেবারে নির্মূল করে দেয়। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট চতুর্থ চার্লস-এর গোল্ডেন বুল (**Golden Bull**)-এর নির্দেশনামার দ্বারা জার্মান সামন্ত রাজাগণ নিজেদের রাজনৈতিক অধিকা-রকে আরও সুসংহত করেন। তাঁরা সম্রাট নির্বাচনের অধিকারসহ অন্যান্য সুবিধা আদায় করে নেন। পবিত্র রোমান সম্রাট এখন থেকে হন তাদের হাতের ক্রীড়নক। বিভিন্ন শহরগুলির মধ্যে মৈত্রীবন্ধন বেআইনী ঘোষিত হয় কিন্তু সামন্তরাজ্যগুলির মধ্যকার সংঘর্ষের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নি। এর ফল হল এই যে জার্মানী এখন প্রকৃত অর্থেই একটি নিরন্তর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কেন্দ্রভূমি রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। এ সংঘর্ষের মূলে ছিল কয়েক শতক ধরে সঞ্চিত লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি এবং বিভিন্ন জাতি-গুলির প্রতি ঘৃণা যা শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষেরই জন্ম দিয়েছিল। পরবর্তী কালে গড়ে ওঠা জার্মানীর জঙ্গী মনোভাব ও জাতি বিদ্বেষের সূত্রপাত এর মধ্য দিয়েই ঘটেছিল।

www.pathagar.com

সামন্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

সামন্তপ্রভুদের আচরণবিধি : শিভালরী

সামন্তপ্রভুশ্রেণীর শিষ্টাচার ও ভদ্র আচরণকে শিভালরী (**Chivalry**) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শিভালরীকে বলা হয় সামন্তবৃক্ষের পুষ্প। শিভালরী শব্দটি এসেছে ক্যাভালিয়ার (**cavalier**—ঘোড় সওয়ার), ক্যাভালরী (**cavalry**—অশ্বারোহী বাহিনী) প্রভৃতি সমজাতীয় শব্দ থেকে। এর কারণ হচ্ছে, সামন্ত ব্যবস্থায় এক ধরনের সামরিক প্রতিষ্ঠান ও বিধি থেকেই প্রথমে শিভালরী প্রথার উদয় ঘটেছিল।

সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা যখন গড়ে উঠেছিল তখন নিয়ম ছিল যে জমিদারী (**Fief**) পেতে হলে অশ্বারোহী সৈন্য হিসাবে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে—প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে, অন্য সময়ে দুর্বৃত্তদের দমন করতে হবে। এ অশ্বারোহী জমিদারদের বলা হত নাইট (**Knight**)। নাইটরা গীর্জা ও পাদরীদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিত এবং দুর্বল, অসহায় ও উৎপীড়িতদের সাহায্য করার শপথ নিত। নাইটরা লোহার বর্ম দিয়ে শরীর ঢেকে, তলোয়ার, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করত। ক্রমশঃ লড়াই করে বেড়ানোই ইউরোপের সামন্ত জমিদারের জীবন যাত্রার স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়াল। এই যোদ্ধা জমিদার শ্রেণী ক্রমশঃ একটি পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হল। অনেক নাইট জমিদারী পরিচালনায় লিপ্ত না থেকে কেবলমাত্র যোদ্ধা নাইটশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। অবশ্য শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ জমিদার বংশের ছেলেরাই কেবল নাইট হতে পারত। মধ্যযুগের শেষভাগে জমিদারের যে সন্তানরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না তারা এসে নাইট হত। ইউরোপের নানাস্থানে প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাজা ও জমিদারের বড় ছেলে পিতার পুরো সম্পত্তির মালিক হত। অন্য ছেলেরা হয় গীর্জার পুরোহিত হত, না হয় নাইট হত।

www.pathagar.com

শিভালরীর প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর নাইটদের শিভালরীর রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার সুনির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সামন্তপ্রভুদের যে ছেলেদের গীর্জায় পাঠানোর ব্যবস্থা হত, তারা ছাড়া অন্য ছেলেদের শিভালরীর নিয়মশৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া হত। ক্ষুদ্র জমিদার ও অভিজাতদের ছেলেদের কোন বিখ্যাত ও বড় জমিদারের পরিবারে রাখা হ'ত। সেখানে তারা নাইটদের কাজকর্ম ও আচরণ বিষয়ে শিক্ষালাভ করত।

নাইটদের শিক্ষা পর্ব শুরু হত সাত বছর বয়সে। এ সময়ে তার নাম হত পেজ (Page) বা ভ্যালেট (Valet)। এখানে জমিদার ও তাঁর অধীনস্থ নাইটরা শিক্ষার্থী বালক পেজকে যুদ্ধবিদ্যা এবং পুরুষ সুলভ বলিষ্ঠ আচরণ শিক্ষা দিতেন। আর জমিদারের পত্নী ও প্রাসাদের অভিজাত মহিলারা ঐ শিক্ষার্থী নাইটকে ধর্মীয় কাজ ও নাইটসুলভ ভদ্র আচরণ বিষয়ে শিক্ষা-দান করতেন। শিক্ষার্থী নাইটরা যাতে প্রভু ও বন্ধুদের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকে, যেন ভদ্র, নম্র, উদার হৃদয় ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয় এবং মহিলাদের প্রতি যেন ভদ্র আচরণ করে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে সে শিক্ষাই তাদের দেয়া হত।

চোদ্দ বছর বয়সে শিক্ষার্থী নাইটের নাম হত স্কোয়ার বা এস্কোয়ার (square, Esquare)। এ সময়ে এক একজন নাইটের উপর তাদের শিক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হত। স্কোয়াররা শিক্ষাদাতা নাইটের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং যুদ্ধবিদ্যা শিখতেন।

একুশ বছর বয়সে এক চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজন স্কোয়ার পুরোপুরি নাইট হতেন। প্রথমে, নাইট হিসাবে তাঁর কি কি করা উচিৎ সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা শোনানো হত। তার পর তিনি জমিদারদের আনুগত্যমূলক 'হোমেজ' (Homage) অনুষ্ঠানের মত হাঁটু ভাঁজ করে নীচু হয়ে তাঁর প্রভুর সামনে বসতেন এবং প্রতিজ্ঞা করতেন যে সারা জীবন ধরে ধর্মকে এবং মহিলাদের রক্ষা করবেন, দুঃস্থদের সেবা করবেন এবং স্বশ্রেণীর নাইটদের প্রতি অনুগত থাকবেন। এরপর তাঁকে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হত এবং তাঁর প্রভু তাঁকে নাইটরূপে ঘোষণা করতেন।

www.pathagar.com

মধ্যযুগে নাইটদের প্রতিযোগিতা বা টুর্ণামেণ্ট (Tournament) ছিল জমিদার ও জনসাধারণের আনন্দ ও আমোদ প্রমোদের একটি বড় অনুষ্ঠান। টুর্ণামেণ্টে বিভিন্ন দলের নাইটদের মধ্যে নকল যুদ্ধ হত। শিভালরীর যুগে টুর্ণামেণ্ট একটি মস্তবড় সার্বজনীন উৎসবের রূপ নিত। কোন একজন রাজা বা ব্যারন টুর্ণামেণ্টের আয়োজন করে বিভিন্ন দেশের ও অঞ্চলের নাইটদের আমন্ত্রণ জানাতেন টুর্ণামেণ্টে অংশ গ্রহণের জন্য। টুর্ণামেণ্টের স্থানটিকে নানা রঙের পতাকা ও প্রতীক চিহ্ন দিয়ে সাজান হত। এখানে বড় বড় যোদ্ধা নাইটরা বর্ম ও প্রতীকে সজ্জিত হয়ে সাধারণতঃ ভোঁতা তলোয়ার ও বল্লম নিয়ে নকল লড়াই করতেন।

যে নাইট বল্লম বা তলোয়ারের আঘাতে প্রতিপক্ষকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে পারতেন বা অন্য নাইটদের বল্লম সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ভাঙতে পারতেন তাঁকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হত। বিজয়ীরা ফুলের তোড়া, ধর্ম, শিকারী কুকুর প্রভৃতি পুরস্কার পেতেন এবং মহিলাদের প্রশংসা লাভ করে ধন্য হতেন। পুরস্কার বিতরণ করতেন কোন অভিজাত মহিলা। বর্তমানকালে যে আমাদের দেশে ও পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহিলারা পুরস্কার বিতরণ করে থাকেন, সে প্রথার মূলে রয়েছে শিভালরীর যুগের ঐ পদ্ধতি।

শিভালরী প্রথার জন্ম হয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। কিন্তু তিনটি বিভিন্ন উৎস থেকে এর উদয় ঘটেছিল। প্রথমত, বর্বরদের একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদের হাতে সামরিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এ প্রথা শিভালরীর অনুষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছিল। দ্বিতীয়ত, খৃষ্টীয় নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ শিভালরীর ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। তৃতীয়ত, আরবী ও প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কাব্যিক গুণ এবং বংশগত প্রতীক ধারণের প্রথাও শিভালরীর আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, মধ্যযুগের জমিদাররা তাঁদের বংশ মর্যাদা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে পোষাক, বর্ম ও ঢালের উপর সিংহ, বাঘ, প্রভৃতি প্রাণীর ছবি ধারণ করতেন। এ প্রথাকে বলা হয় হেরাল্ড্রি (Heraldry)।

www.pathagar.com

পনের শতকের পর থেকে ক্রমশ শিভালরী প্রথার বিলোপ ঘটতে শুরু করে। যে সকল কারণে সামন্ত প্রথার বিলোপ ঘটেছিল সে একই কারণে শিভালরী প্রথার অবনতি ও বিলোপ ঘটেছিল। এটাই স্বাভাবিক, কারণ শিভালরী প্রথা ছিল সামন্ত প্রথা থেকেই উদ্ভূত ও তারই একটি অঙ্গ। মধ্য-যুগের শেষে কামান, বারুদ ও বন্দুকের আগমনের ফলে যুদ্ধের রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ক্রমশ জাতীয় রাষ্ট্রের উদয় ঘটে এবং জাতীয় সরকার গঠিত হয়। ইউরোপের দেশে দেশে সামন্ত অর্থনীতির স্থানে যতই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন হতে থাকে, ততই মানুষের মনে নতুন চিন্তা চেতনার উদয় ঘটতে থাকে। এ ভাবে শিভালরীর মোহ মানুষের মন থেকে ক্রমে মিলিয়ে যায়। জাতীয় সরকার ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ দেশে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলে দুর্বলদের রক্ষার জন্য আর নাইটদের প্রয়োজন থাকে না, আইন রক্ষাকারী সংস্থাই এখন সে কাজ করতে শুরু করে।

মধ্যযুগের অবসানের সাথে সাথে ইউরোপের শিভালরী প্রথার বিলোপ ঘটলেও শিভালরীর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। শিভালরীতে দীক্ষা দেয়ার সময়ে নাইটদের ভদ্রতা, নম্রতা, মানবিকতা, আনুগত্য, উদারতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণ শিক্ষা দেয়া হত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মহিলাদের প্রতি সৌজন্যমূলক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের শিক্ষা নাইটদের দেয়া হত। বস্তুত, নারীর প্রতি ভদ্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ও আচরণ হল শিভালরীর একটা প্রধানতম লক্ষণ ও অঙ্গ। এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা, কারণ প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে, প্রাচীন মিশরে বা ব্যাবিলনে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত-বর্ষে বা চীনে কোথাও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব বিদ্যমান ছিল না। সত্য বটে, মধ্যযুগে শিভালরীর ধারণা শুধুমাত্র জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং জমিদার-নাইটরাও সবসময় পুরোপুরি শিভালরীর আদর্শকে আয়ত্ত বা অনুসরণ করেননি। বস্তুত, অনেক নাইটই সুযোগ পেলে লুটতরাজ, মারামারি এবং স্ত্রীলোকের সাথে অসদাচরণ করতেন, বিশেষতঃ যদি সে মহিলারা অভিজাত শ্রেণীর বাইরের হতেন।

www.pathagar.com

ভ্রাম্যমান নাইটরা অনেক সময়েই আবার বাহাদুরী করার জন্য মহিলাদের সম্মান রক্ষার নামে নিরীহ পথচারীদের আক্রমণ করতেন। শিভালরীর আদর্শ রক্ষা করার নামে নাইটরা প্রায়ই পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে (**Duel**) লিপ্ত হতেন। এর ফলে অযথা এত রক্তপাত হত যে শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারের অবসান ঘটানোর জন্য পোপকে হস্তক্ষেপ করতে হয় (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৫)। এসকল নাইটদের অদ্ভুত কার্যকলাপকে বিদ্রূপ করে স্পেনীয় সাহিত্যিক সেরভান্টেস তাঁর সুবিখ্যাত ব্যঙ্গ কাহিনী 'ডন কুইকজোট' রচনা করেছিলেন।

কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও শিভালরীর আদর্শটা যে শিক্ষা দেয়া হত সেটাই বড় কথা। এর ফলে মধ্যযুগের অবসানে রেনেসাঁসের যুগে যখন নতুন মানবতাবাদী আদর্শের নব উন্মেষ ঘটে, তখন শিভালরীর আদর্শ সে মানবতাবাদকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলেই আধুনিক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে পূর্ণ মানুষের মর্যাদা দান করা হয়েছে যা প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল।

মধ্যযুগের শিভালরীর আদর্শের প্রভাবেই আধুনিক যুগের ইউরোপ থেকে নারীর মর্যাদার ধারণা ক্রমশঃ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে মধ্যযুগের ইউরোপের শিভালরীর আদর্শ বিশ্ব সংস্কৃতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে।

মধ্যযুগের চিন্তা ও দর্শন

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ছিল স্বনির্ভর, বদ্ধ, ক্ষুদ্র ম্যানরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। স্বভাবতঃই সামন্তযুগের মানুষের চিন্তাধারাও ছিল তেমনি একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামন্তযুগের অপরিবর্তনশীল সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের চিন্তাশক্তিকেও সীমিত করে রেখেছিল। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ মানুষ একটি অপরিবর্তনশীল সমাজ ও অর্থনীতি প্রত্যক্ষ করেছে—একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বাস করেছে ; ম্যানরের বাইরে সে

www.pathagar.com

কখনও যায়নি—যাওয়ার প্রয়োজনও অনুভব করেনি। এক্ষেত্রে ম্যানরটি তার কাছে সমগ্র জগৎ, এর মানুষগুলির সাথেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার পরিচয়। ম্যানরের প্রভু এবং চার্চই তার ইহকাল পরকালের মালিক, এর সেবাই তার জীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য।

মধ্যযুগে চার্চও এই একই আদর্শ প্রচার করেছে। সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক ছিল চার্চ। গীর্জার ধর্মযাজকও মানুষকে জগৎ সম্পর্কে এই ধারণাই দিয়েছে—দিয়েছে এক একটি গোলকের ধারণা—চন্দ্র-সূর্যের গোলক, গ্রহদের গোলক, সকলের উপরে স্থির নক্ষত্রের গোলকসমূহ, যার উপরে আছে স্বর্গলোক। প্রচলিত ব্যবস্থাকে মেনে নেয়াই ছিল স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র উপায়—তা না হলে আছে অনন্ত নরক, দান্তের 'ইনফার্ণোতে' যার ভয়াবহ চক্রের কথা বর্ণিত আছে।

সাধারণভাবে মধ্যযুগের চিন্তার বৈশিষ্ট্য হল: অবিচল নিয়মের উপর গভীর আস্থা। বিভিন্ন পর্যায়ে এ সকল নিয়মকে ক্রিয়াশীল বলে মনে করা হত। যথা, মহাজাগতিক নিয়ম, সামাজিক নিয়ম, মানুষের দেহের ভিতরের নিয়ম ইত্যাদি। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানও জগতে নিয়মের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুজগৎকে পর্যবেক্ষণ করে তার নিয়ম আবিষ্কার করে। আর মধ্যযুগে খৃষ্টীয় পাদ্রী এবং দার্শনিকদের কল্পিত নিয়মকে বস্তুজগতের উপর আরোপ করা হত। গীর্জা সংস্থা এবং সামন্ত প্রথার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথাকেই শুধু মধ্যযুগে জগতের নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা হত, সে কথা সঠিকই হোক বা অবাস্তবই হোক। মধ্যযুগীয় চিন্তায় পৃথিবীতে সব কিছুই নিজ নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। সমাজে জমিদারদের স্বাভাবিক স্থান ছিল উঁচুতে এবং কৃষকদের স্বাভাবিক স্থান ছিল নীচুতে। এই জগৎ ব্যবস্থার মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতেরও নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল; সেটা কেবল মানুষের প্রয়োজন মেটানোই নয়, তাকে নৈতিক শিক্ষাদানও বটে—যেমন, পিঁপড়ার শ্রমশীলতা, সিংহের সাহসিকতা ইত্যাদি। এই বিশাল, জটিল অথচ সুশৃঙ্খল জগৎ ব্যবস্থা তাদের কাছে যুক্তিসহও ছিল। এর মধ্যে এরিস্টটলীয় সিদ্ধান্ত এবং বাইবেল ও গীর্জার সন্দেহাতীত

www.pathagar.com

সত্যসমূহের সমন্বয় ঘটেছিল। এভাবে বদ্ধ অর্থনীতির পটভূমিকায় সামন্ত সমাজ সৃষ্টি করেছিল এক স্থির, অচঞ্চল ও অপরিবর্তনেয় জগতের।

এই অপরিবর্তনেয় জগতে পরিবর্তন এল যখন শহরগুলির উৎপত্তি ঘটল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব ঘটল এমন এক শ্রেণীর যারা কয়েক শতাব্দীর সামন্ত প্রথার শিকল ভাঙতে উদ্যত হয়েছে। এই নগর জীবনের প্রভাব এসে পড়ল ম্যানরের মধ্যেও। ম্যানরবাসীর চিরকালের ধ্যান ধারণা পাল্টে যেতে লাগল, সেই সঙ্গে চার্চের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটতে লাগল কিছু কিছু। ধর্মযাজকগণ ক্ষিপ্ত হল বার্গারদের উপর—সামন্ত প্রথার বিরোধীদের ঘোষণা করা হল ঈশ্বরবিরোধী (**Heretic**) বলে, বিধান দেয়া হল তাদের পুড়িয়ে মারার। কিন্তু সমাজের পরিবর্তন রোধ করা গেল না, ঠেকিয়ে রাখা গেল না ইতিহাসের অমোঘ গতিকে। ক্রুসেডের মাধ্যমে ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি করা হলেও এর ফলাফল চার্চের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করল। ক্রুসেড পরোক্ষভাবে সামন্ত প্রথাকেই আঘাত করল—শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়; চেতনার ক্ষেত্রে এর পরিব্যাপ্তি সকলকেই গ্রাস করল। আর চার্চ চেষ্টা করল নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে এবং সেজন্য সে বাধ্য হল গ্রীক দর্শনের শরণাপন্ন হতে, যাকে সে একদা পরিত্যাগ করেছিল ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে।

মধ্যযুগের ইউরোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে চার্চ বা গীর্জা সংগঠন। মধ্যযুগের চিন্তা ও দর্শনকেও গীর্জাই নিয়ন্ত্রিত করেছে। যেসব সূত্র বা উৎসকে গীর্জার ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হত সেগুলো হল : বাইবেল বা যীশুখৃষ্টের বাণী, সেন্ট অগাষ্টিন ও অন্যান্য ধর্মগুরুদের রচনা এবং গীর্জা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ। এ সকল উৎসকে অভ্রান্ত ও খাটি সত্য বলে মনে করা হত। কিন্তু চার্চ এ সকল মতবাদ ও গোঁড়ামি দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে পারলেও এক পর্যায়ে এসে বিপত্তি দেখা দিল। পণ্ডিতরা যখনই চার্চের গোঁড়া মতবাদের কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি খুঁজে পেতেন না তখনই নানা রকম মতের উদ্ভব হত।

বার শতকে প্রাচীন গ্রীকদের ও মধ্যযুগের মুসলমানদের রচনা ইউরোপে

www.pathagar.com

এসে পৌঁছালে ইউরোপের ধর্ম ও দর্শন চিন্তায় প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়। মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে ইউরোপে শুধু ল্যাটিন ধর্মগুরু এবং প্লিনী প্রমুখ রোমান পণ্ডিতের রচনার প্রচলন ছিল। প্লেটো, এরিষ্টটল বা আর্কিমিডিসের গ্রীক রচনাগুলির সাথে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রথমদিকে পরিচিত ছিলেন না। মুসলমানরা যে সব গ্রন্থ গ্রীক থেকে আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন সে সব অনুবাদ বার শতকে ইউরোপে এসে পৌঁছুতে শুরু করে। ক্রুসেডের সময়েও অনেক পণ্ডিত বাইজেন্টাইন অঞ্চল থেকে গ্রীক পাণ্ডুলিপিসহ ইটালী প্রভৃতি স্থানে চলে আসেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এসব আরবী ও গ্রীক পাণ্ডুলিপিকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এভাবে বার শতকে প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত এবং মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের রচনা ইউরোপে এসে পৌঁছায়। এরিষ্টটলের নীতিবিদ্যা (এথিক্স্), কাব্যশাস্ত্র (পোয়েটিক্স্), অলঙ্কার শাস্ত্র (রেটোরিক্স্) প্রভৃতি গ্রন্থ সরাসরি গ্রীক থেকে অনূদিত হয়। এরিষ্টটলের যুক্তিশাস্ত্র সম্পর্কিত সমস্ত রচনা ইউরোপে এসে পৌঁছালে তাঁকে মধ্যযুগের পণ্ডিতরা যুক্তিশাস্ত্রের সেরা পণ্ডিত হিসাবে মেনে নেন। বস্তুতঃ মধ্যযুগের পণ্ডিতরা ক্রমে এরিষ্টটলের রচনাকে বাইবেলের পরেই স্থান দেন। এছাড়া ইউক্লিডের জ্যামিতি ও 'আল-খারিজমি'র বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ টলেমী রচিত 'আল মাজেষ্ট' এবং হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও ইবনে সিনার চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীও মধ্যযুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে পৌঁছেছিল।

এরিষ্টটল ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের রচনা পড়ে ইউরোপের মধ্যযুগের পণ্ডিতরা বুঝতে পারেন যে এরিষ্টটলের যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে চার্চের ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারলে একটা দুরূহ দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বাইবেলও খৃষ্টীয় ধর্মগুরুদের শিক্ষার সাথে প্লেটো-এরিষ্টটলের দর্শনের সমন্বয় সাধন। এ সমন্বিত দর্শনের নাম স্কলাস্টিক দর্শন (**Scholastic Philosophy** বা **Scholasticism**)। স্কলাস্টিক দর্শনের সূত্রপাত করেছিলেন ফরাসী

www.pathagar.com

পাদ্রী ও দার্শনিক পিটার আবেলার্ড (১০৭৯—১১৪২ খৃঃ)। এগার শতকে ইউরোপের খৃষ্টান পণ্ডিতদের মধ্যে দুটো দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়েছিল। একটি মত অনুসারে শ্রেণীগত নামের বা সাধারণ নামবাচক শব্দের অস্তিত্ব নেই, শুধুমাত্র মূর্ত পদার্থেরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে; যেমন, প্রত্যেকটা আমের পৃথক পৃথক এবং বাস্তব অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সাধারণভাবে আম বললে কোন বাস্তব পদার্থ বোঝায় না; এ ধরনের শ্রেণীগত নাম একটি বিমূর্ত ধারণা। এ মতটি নামবাদ বা নমিনালিজম (**Nominalism**) নামে পরিচিত হয়েছে। নামবাদের একটা অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, গীর্জা একটি সাধারণ নামবাচক শব্দ, অতএব গীর্জা সংগঠনের কোন বাস্তব অর্থ নেই। একারণেই গোঁড়া খৃষ্টানরা এর বিরুদ্ধে এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

নামবাদের বিরোধী অপর একটি মত ছিল: সাধারণ (**general**) ধারণাই একমাত্র বাস্তব সত্য, তাদের নাম যাই হোকনা কেন। এ মতের নাম দেয়া হয়েছে বাস্তববাদ বা রিয়ালিজম (**Realism**)। এই মতের প্রবক্তারা অন্য মতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতেন। পিটার আবেলার্ড এ দুই মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি বলেন যে, বস্তুর নামের মধ্যে কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই ঠিকই, কিন্তু কোন বস্তুর যেমন নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, তেমনি তার নামও আমাদের মনে একটি ধারণার সৃষ্টি করে, এবং আমাদের মনে ও চিন্তায় ঐ নামটির অস্তিত্ব থাকে। এ অর্থে, শ্রেণীগত নামের একটা বাস্তবতা আছে।

পিটার আবেলার্ড অনিসন্ধিৎসু মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, 'জ্ঞান লাভের চাবিকাঠি হচ্ছে প্রশ্ন, বিরামহীন প্রশ্ন। সন্দেহ আমাদের নিয়ে যায় অনুসন্ধানের পথে; অনুসন্ধান দ্বারা আমরা সত্যকে লাভ করি।'

আলবার্টাস ম্যাগনাস (জন্ম ১১৯৩ খৃঃ) এবং সেন্ট টমাস একুইনাস (জন্ম ১২২৫ খৃঃ) নামক দুইজন পণ্ডিতের চেষ্টায় ১৩ শতকে স্কলাস্‌টিক দর্শন গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এ দর্শনের সৃষ্টিতে সেন্ট টমাস একুইনাসের অবদানই ছিল বেশী। আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে স্কলাস্‌টিক দর্শনের মূল পার্থক্য

www.pathagar.com

এখানেই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎ স্থির নয়, পরিবর্তনশীল; কিন্তু মধ্যযুগীয় দৃষ্টিতে জগৎ ছিল স্থির, অচঞ্চল, অপরিবর্তনেয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থ ও প্রক্রিয়ার উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ নির্ণয় করা; বস্তুর ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থির করা এবং বিভিন্ন বস্তু ও প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ যোগ-সূত্র নির্ণয় করা। কিন্তু স্কলাস্‌টিক দর্শনের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন পদার্থের গুণ ও ধর্ম নিরূপণ করা, বিভিন্ন পদার্থ ও ঘটনার গুঢ় অর্থ নির্ণয় করা। মধ্যযুগীয় দৃষ্টিতে জগৎকে স্থবির ও অপরিবর্তনশীল বলে ধরে নেয়া হত। তাই বস্তু-জগতের বিকাশ ও রূপান্তরের কারণ বিশ্লেষণ করার সমস্যাটাই স্কলাস্‌টিক দর্শন অনুভব করতে পারেনি। পরিবর্তন ও বিকাশই যে জগতের মূল বৈশিষ্ট্য একথাটাই মধ্যযুগের স্কলাস্‌টিক দার্শনিকরা জানতেন না বা মানতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী, গীর্জা চিরস্থায়ী; এ বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে চিন্তা ও দর্শন তা হল: জগৎ পরিবর্তনহীন। এ কারণেই মধ্যযুগের দার্শনিকরা স্বভাবতই বিশ্বাস করতেন যে জগৎ স্থবির ও অপরিবর্তনেয়।

সেন্ট টমাস একুইনাস ১২২৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ইটালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খৃষ্টান ক্যাথলিক মতের ডোমিনিকান শাখায় যোগদান করেন। পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তবে তাঁর রচনার মধ্যে 'ঈশ্বর তত্ত্বের সার-কথা' গ্রন্থটিই সবচেয়ে বিখ্যাত। এরিষ্টটলের দর্শন ও বাইবেলের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে সেন্ট টমাস একুইনাস দেখাতে চেষ্টা করেন যে বিশ্বজগৎ নিয়মশৃঙ্খলা ও যুক্তি মেনে চলে। তিনি বলেন যে খৃষ্টীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পরকালে মানবজাতির মুক্তি সাধনের বিষয়ে সহায়তা করার জন্যই সমস্ত বস্তুজগতের সৃষ্টি হয়েছে। এরিষ্টটল মনে করতেন যে, এ বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট স্থান ও কর্তব্য আছে; কোন একটি বিশ্ব পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে সমস্ত ঘটনা ঘটে। এ মতের নাম দেয়া হয়েছে টেলিওলজি (**Teleology**) বা

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যবাদ। টেলিওলজি অনুসারে প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার সৃষ্টি হয় একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। অপরপক্ষে বিজ্ঞান বলে যে প্রত্যেক ঘটনা ঘটে তার আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ সম্পর্কের দরুন। বিজ্ঞান বলে যে কারণ ছাড়া কাজ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের কার্যকারণ সূত্র টেলিওলজি তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। স্কলাস্‌টিক দর্শন এরিষ্টটলের টেলিওলজি ও অন্যান্য ভ্রান্ত দর্শনকে গ্রহণ করেছিল। মধ্যযুগের শেষদিকে এরিষ্টটলকে বাইবেলের মত অভ্রান্ত মনে করা হত। স্কলাস্‌টিক দর্শনের সাথে সঙ্গতি থাকায় আরও দুজন গ্রীক পণ্ডিতকে মধ্যযুগে প্রায় এরিষ্টটলের সমান মর্যাদা দেয়া হত। এঁদের একজন হলেন জ্যোতির্বিদ টলেমি, আরেকজন গ্যালেন।

জ্যোতির্বিদ টলেমী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে 'আলমাজেস্ট' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আলমাজেস্ট নামটি অবশ্য মুসলমানদের দেয়া। এ গ্রন্থে বলা হয়েছিল যে পৃথিবী স্থির ও সূর্য তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এ মত খৃষ্টান চার্চ ও স্কলাস্‌টিক পণ্ডিতরা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কোপার্নিকাস নতুন করে প্রমাণ করেন যে সূর্য স্থির, পৃথিবীই ঘুরছে। তবে টলেমীর পৃথিবী-কেন্দ্রিক মতবাদ ভুল হলেও আল মাজেস্ট গ্রন্থটির বাস্তব উপযোগিতা ছিল। এ গ্রন্থে বর্ণিত পদ্ধতি ও নানা প্রকার তালিকার সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করা যেত।

চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ গ্যালেন (১৩০ ২০০ খৃঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে যে গ্রন্থ রচনা করেন সেটিও গীর্জা এবং স্কলাস্‌টিক দার্শনিকদের অনুমোদন লাভ করেছিল কারণ স্কলাস্‌টিকদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে এ গ্রন্থটি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে ভেসালিয়াস (১৫১৪-১৫৬৪ খৃঃ) নতুন গ্রন্থ রচনা করে গ্যালেনের ভুল ত্রুটি নির্দেশ করেন। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত গ্যালেনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

মধ্যযুগের স্থবির দৃষ্টিভঙ্গী, স্কলাস্‌টিক দর্শন, এরিষ্টটল, গ্যালেন ও টলেমীর ভ্রান্তবিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগের সমস্ত জ্ঞানচর্চার বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছিল। ক্রমে, এরিষ্টটলের প্রভাব এত সর্বব্যাপী হয়েছিল যে,

www.pathagar.com

এরিষ্টটলকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন না করে বিজ্ঞানের পক্ষে আত্মপ্রকাশই সম্ভব হচ্ছিল না। অবস্থা এমন হয়েছিল যে উইপোকার চোখ আছে কিনা জানার জন্য পণ্ডিতরা বাইবেল ও এরিষ্টটলের লেখা পড়ে দেখতেন, উইপোকা ধরে দেখতেন না। কারণ বাস্তব পর্যবেক্ষণ যে জ্ঞানলাভের একটা প্রধান উপায় তা স্কলাস্‌টিক দার্শনিকরা মানতেন না। তারা মনে করতেন যে সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বা সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রই হল জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস ও পদ্ধতি। তাঁদের মতে এরিষ্টটল ছিলেন এ রকম একটা সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য উৎস (**authority**)। একবার একজন ছাত্র সূর্যের গায়ে কালো দাগ বা সৌর কলঙ্ক দেখে তাঁর শিক্ষককে জানিয়েছিলেন, ঐ স্কলাস্‌টিক শিক্ষক জবাবে বলেছিলেন যে, ঐ রকম দাগের কথা এরিষ্টটলের কোন গ্রন্থে লেখা নেই, অতএব ঐ দাগ নিশ্চয়ই ছাত্রের চোখেই রয়েছে, সূর্যের গায়ে নয়।

মধ্যযুগের শেষদিকে স্কলাসটিক দর্শনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হয়। পূর্বোক্ত নামবাদ (**nominalism**) আবার নতুন রূপে ব্যাপ্তি লাভ করে। নামবাদীরা বললেন যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ না থাকলে কোন কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁরা বললেন যে শুধু মাত্র বিমূর্ত যুক্তির সাহায্যে কোন সত্যে বা ধর্মীয়-সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। এবার নামবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ইংরেজ পাদ্রী উইলিয়াম অফ ওকাম (**william of Occam**)। এ দার্শনিকের রচনা ও যুক্তি-কৌশল পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক প্রগতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। কালক্রমে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার ঘটার সাথে সাথে মধ্যযুগের স্কলাস্‌টিক দর্শনও বিলুপ্ত হয়েছিল।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের সাহিত্য

মধ্যযুগের ইউরোপে প্রথম দিক থেকেই চিরায়ত গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ এ সকল সাহিত্য পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সাহিত্যের নান্দনিক শিল্পিক দিককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়। পোপ প্রথম গ্রেগরী ধর্মপুস্তকগুলিকে ব্যাকরণের অনুশাসন মেনে চলা সম্পূর্ণ অপ্রোয়জনীয় বলে মনে করেন।

গ্রীক-ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের স্থান দখল করে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে তা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় দেশীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন অষ্টম শতাব্দীতে রচিত এ্যাংলো-স্যাক্সনদের **Beowulf** নামক মহাকাব্যটি। প্রাচীন জার্মান জাতির ঐতিহ্য ও বীরত্বের গাথা বর্ণিত হয়েছে এই মহাকাব্যটিতে।

এ যুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে আইরিশদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আইরিশ লেখক ও সন্তগণ তাঁদের স্থল ও সামুদ্রিক অভিযানের উপর বহু কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণাঢ্য বর্ণনার উপর ভিত্তি করেও অনেক কবিতাও রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের শেষের দিকে গ্রীক-ল্যাটিন সাহিত্যের প্রতি পুনরায় আগ্রহের সৃষ্টি হতে থাকে যা পরবর্তীকালে রেনেসাঁর জন্ম দেয়। চার্চ ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ল্যাটিন ভাষায় কাব্য, বিশেষতঃ গীতিকাব্য রচনা শুরু হয়। গলিয়ার্দী নামক কবিরা এই ধরনের কাব্য রচনা করেন। এদের কবিতাগুলি সাধারণতঃ মানব মানবীর প্রেম, ঋতুচক্রের সুদৃশ্য বর্ণনা অথবা স্বাধীন মুক্ত জীবনের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত। ধর্ম-যাজকদের জীবন ও চরিত্র নিয়ে প্যারডি কাব্যও এঁরা রচনা করতেন। এঁরা নিজেদের গলিয়ার্দ্ বা 'শয়তানের শিষ্য' বলে ঘোষণা করতেন। প্রধানত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভবঘুরে ছাত্ররাই ছিলেন এ শ্রেণীভুক্ত

www.pathagar.com

কাব্যের রচয়িতা। মধ্যযুগের প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে এঁরাই সর্বপ্রথম সাহিত্যের মাধ্যমে সোচ্চার বক্তব্য পেশ করেন।

ল্যাটিন সাহিত্যের পাশাপাশি দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হতে থাকে। মহাকাব্যগুলি পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ফরাসী ভাষায় রচিত হয় **Song of Roland,** জার্মানী ভাষায় **Song of the Nibelungs** স্পেনীয়া ভাষায় **Poem of my Cid** এবং নর্মানদের **Saga** গুলি। এগুলির মূল বিষয়বস্তু ছিল বীরত্ব, সম্মান ও প্রভুর প্রতি আনুগত্য দেখান। নায়কের পৌরুষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই এ সকল রচনার মূল উদ্দেশ্য।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সামন্তসমাজের মন ও মানসিকতার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার কিছুটা প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সে যুগের সাহিত্যে। এ যুগের চারণ কবিদের কাব্যে তাই পাওয়া যায় সামন্ত রমনীর প্রেমোপাখ্যান, তার সুমধুর হাসি, তার স্বর্গীয় রূপের অপূর্ণ বর্ণনা। এদের কাব্যে ধর্ম যাজকদের লোভ ও মোনাফেকীর চমৎকার ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা পাওয়া যায়।

সামন্ত ভাবাদর্শের পরিপূর্ণ রূপের পরিচয় পাওয়া যায় আর্থারিয়ান চক্রের রোমান্টিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে। এই রোমান্টিক উপাখ্যানগুলির মূল বিষয় সংগ্রহ করা হয়েছে বিখ্যাত কেল্টিকবীর আর্থারের কাহিনী থেকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কয়েকজন নর্মান ও ফরাসী লেখক আর্থারের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে কতগুলো উপাখ্যান রচনা করেছেন যার মূল বিষয় হল প্রেমের রোমান্স ও এডভেঞ্চার, যেগুলি ছিল উজ্জল বর্ণনায় সমৃদ্ধ ও কাব্যসৌন্দর্যে অনুপম। পরবর্তীকালে কয়েকজন জার্মান লেখকের রচনাও এর সাথে যুক্ত হয়। এই কাহিনীগুলিতে বীরত্ব, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, বিপন্নকে উদ্ধার, দুর্বলকে রক্ষা প্রভৃতি নাইটদের যাবতীয় আদর্শের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। তবে প্রেমের রীতির ব্যাপারে এ সকল কাহিনীর লেখকদের মধ্যে মতবিরোধ অনেক সময় পরিস্ফুট হয়েছে। কারও

www.pathagar.com

কারও মতে দাম্পত্য প্রেমই আদর্শ প্রেম। অন্যেরা আবার পরকীয়া প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। এ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট রোমান্টিক উপাখ্যান-গুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিয়োগাত্মক ভাবে। জার্মান লেখক গটফ্রিড ভন ষ্ট্রাসবুর্গ-এর **Triston** গ্রন্থটি এ ধরনের রচনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হল : প্রেম মানেই দুঃখ ও দহন এবং এর পরিণতি ঘটে শুধুমাত্র ব্যাথা, বিয়োগ ও মৃত্যুতে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের সাহিত্যে বার্গারদের প্রবেশ ঘটে। এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ **Aucassin and Nicolitte**। স্পেনের পট-ভূমিতে রচিত এই গ্রন্থের নায়ক অকাসিন একজন সামন্ত নাইট। সে প্রেমে পড়ল নিকোলেট নামের একটি সারাসিন ক্রীতদাসীর। সমাজের দৃষ্টিতে এ প্রেম অবৈধ। অকাসিনের প্রতি সমাজ ও ধর্মপতিদের সাবধান বাণী উচ্চারিত হল : যদি সে তার প্রেমিকাকে পরিত্যাগ না করে তাহলে সে অনন্তকাল নরকভোগ করবে। এর উত্তরে অকাসিন বলল, তাতে তার কিছু এসে যায়না কারণ নরকে সে তাদেরই সান্নিধ্যলাভ করবে যারা এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে বেঁচেছিল। মধ্যযুগের কোন নায়ক সমাজের ভ্রূকুটিকে এমন নির্বিকারভাবে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে?

নগরবাসীদের আরেকটি প্রিয় গ্রন্থ **Fabliaux** নামের গল্প সংগ্রহটি। অনেকটা অশোভন ভাবে এতে দেখান হয়েছে শিভ্যালরির অসারতা, নাইটদের এডভেঞ্চারের নামে ফাঁপা বীরত্ব প্রভৃতি। সাথে সাথে এর মধ্যে আছে ধর্মযাজকদের প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ হল উইলিয়াম অফ লরিস ও জন অফ মিউয়েন রচিত **Romance of the Rose** এবং দান্তের **Divine Comedy**। **Romance of the Rose** গ্রন্থটি দুখণ্ডে রচিত। এর প্রথম খণ্ডের রচয়িতা উইলিয়াম অব লরিস তাঁর রচিত অংশে শিভালিরীমূলক প্রেমকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অংশের রচয়িতা জন অব মিউয়েন অবশ্য মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ

www.pathagar.com

সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দিহান। তিনি সকল কুসংস্কার ও ধর্মের নামে প্রচলিত সকল অনাচারের প্রচণ্ড বিরোধী। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে বার্গার শ্রেণীর আদর্শের প্রতিভূ।

Romance of the Rose গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের শেষদিকের সমাজের দুটি বিপরীত শ্রেণীর চিন্তাধারার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর সর্বাপ্রেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ **Divine Comedy**। এর রচয়িতা দান্তে আলেঘিরি (১২৬৫-১৩২১ খৃঃ) ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে ইতালীর ফ্লোরেন্সের একজন আইনজীবীর পুত্র। প্রথম জীবনে তিনি ফ্লোরেন্সের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি দর্শন ও সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। এক পর্যায়ে দান্তে যে রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন সে দল ফ্লোরেন্সের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয় এবং দলটিকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হয়। ফলে দান্তেকেও ফ্লোরেন্স থেকে বহিষ্কৃত হতে হল। জীবনের বাকী অংশ তিনি জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত অবস্থায় কটান। এই নির্বাসিত জীবনেই তিনি তাঁর বিখ্যাত **Comedy** গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী-কালে দান্তের অনুরাগীবৃন্দ এ গ্রন্থের নামকরণ করেন **Divine Comedy**। মধ্যযুগের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির পুরো পরিচয় এ গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়। সামন্তযুগের স্কলাসটিক দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, অর্থনীতি ও নৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এ গ্রন্থটিতে।

এই গ্রন্থের মূল বিষয় হল যুক্তি ও ঐশ্বরিক আশীর্বাদ দ্বারা মানবাত্মার মুক্তি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ যার কেন্দ্রস্থলে এই পৃথিবী অবস্থিত এবং এর সবকিছুই সৃষ্ট হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে কোন না কোন ঐশ্বরিক শাস্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যার সর্বশেষ উদ্দেশ্য মানবাত্মার মুক্তি। এই গ্রন্থের নায়ক দান্তে নিজেই। নায়িকা বিয়াত্রিচের সাথে সাথে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন স্বর্গ, মর্ত ও পারগেটরি। সে সব স্থানে তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছেন পোপ, সম্রাট, রাজা, বীর, কবি, শিল্পী এবং জ্ঞানী-

www.pathagar.com

গুণী ব্যক্তিদের। এঁদের সকলের পরিচিতি তিনি তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এবং সাথে সাথে বর্ণনা করেছেন তাঁদের কীর্তি কাহিনী। এঁদের কথা মধ্যযুগের মানুষেরা অনেক আগেই বিস্মৃত হয়েছিল। দান্তেকে বলা হয় রেনেসাঁর অগ্রদূত। কারণ তিনি তাঁর **Divine Comedy**-র মধ্য দিয়ে প্রাচীন গ্রীক-রোমান ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন, বহু শতাব্দীর বিস্মৃত ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুত্থান রেনেসাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দান্তে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে মানবতাবাদী। মনে প্রাণে ধার্মিক হলেও ধর্মীয় গোঁড়ামীর অনেক উর্ধ্বে ছিল তাঁর অবস্থান। তাই যেমন এরিষ্টটল, সেনেকা, ভার্জিল ও অন্যান্য রোমান সাহিত্যিকদের তিনি পারগেটরিতে মনোরম পরিবেশে স্থান দিয়েছেন, তেমনি অনেক পোপকে আবার নরকে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর উচ্চ কল্পনা শক্তি, কাব্যরীতি এবং সর্বোপরি তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তিনি যথার্থভাবেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছেন।

মধ্যযুগের শিল্পকলা

মধ্যযুগের শিল্পকলা স্থাপত্য শিল্পকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। আর ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছিল স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে। অবশ্য মধ্যযুগের ইউরোপে স্থাপত্য বলতে একমাত্র গীর্জার স্থাপত্যকেই বোঝাত। সমগ্র ইউরোপে দুটি বিশিষ্ট স্থাপত্যরীতির উদ্ভব ঘটেছিল, যথা রোমানেস্ক্ ও গথিক রীতি।

খৃষ্টানরা প্রথম অবস্থায় আর্থাৎ রোমান যুগে মাটির নীচের ঘরে গোপনে উপাসনা করত, কারণ সে সময়ে খৃষ্টধর্ম বেআইনী ছিল। পরে রোমান যুগের শেষদিকে যখন খৃষ্টানরা প্রকাশ্যে উপাসনা করার অধিকার পেল

www.pathagar.com

তখন তারা রোমান রীতির গৃহ নির্মাণ করত। পরবর্তীকালে ক্যারো-লিঞ্জিয়ান যুগে নতুন ও বড় আকারের উপাসনাগৃহের প্রচলন হয়। এ সকল গৃহ সাধারণত কাঠের তৈরী ছিল বলে নবম ও দশম শতকের অরাজকতার সময়ে সেগুলি ধ্বংস হয়ে যায়।

রোমানেস্ক স্থাপত্য

এগার শতকে ক্লুনির সংস্কারের সাথে সাথে নতুন ধরণের স্থাপত্য রীতির আবির্ভাব ঘটে। এ স্থাপত্য রীতির নাম রোমানেস্ক্ (**Romanesque**) শৈলী।

রোমানেস্ক স্থাপত্য শৈলীতে গোলাকৃতি খিলান ব্যবহার করা হত। রোমানেস্ক স্থাপত্য শৈলীতে রোমান স্থাপত্য রীতির অনুকরণে খিলান নির্মাণ করা হত।

রোমানেস্ক রীতির গীর্জা ইউরোপের সর্বত্রই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এ সকল গীর্জার দেয়ালগুলি ভারী ও পুরু হত এবং দেয়ালে বেশী জানালা কাটা যেতনা। পরবর্তীকালে গথিক রীতির গীর্জায় এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।

রোমানেস্ক্ স্থাপত্যের অনুরূপ রোমানেস্ক ভাস্কর্যেরও উদয় ঘটেছিল। গীর্জার অভ্যন্তর ভাগের অলঙ্করণের জন্য এ সকল ভাস্কর্য ব্যবহৃত হত।

গথিক স্থাপত্য

বার তের শতকের রোমানেস্ক নীতির পরিবর্তে গথিক রীতির গীর্জা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গথিক রীতি অবশ্য বর্বর গথদের উদ্ভাবিত না। পরবর্তীকালে রেনেসাঁর যুগের পণ্ডিতরা অবজ্ঞাভরে এ সকল মধ্যযুগীর গীর্জাকে গথিক বা 'বর্বরোচিত' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

গথিক গীর্জার খিলানগুলি উঁচু ও সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট হত। এর নির্মাণ কৌশল এমন ছিল যে খিলানের কাঠামোগুলিই ছাদের ভার সহ্য করতে

www.pathagar.com

পারত, ভারী দেয়ালের প্রয়োজন হত না। গথিক গীর্জায় তাই অনেক বেশী পরিমাণে জানালা রাখা হত। ইউরোপের উত্তরাংশে সূর্যের আলো কম বলে জানালার প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশী। রোমানেস্ক গীর্জাগুলি গড়ে উঠেছিল মঠসমূহের উদ্যোগে। কিন্তু গথিক গীর্জাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই শহরের মানুষদের উদ্যোগ ও উদ্যমের ফলে তৈরী হয়েছিল।

গথিক গীর্জার অভ্যন্তর ভাগকে অলঙ্কৃত করার জন্য গথিক ভাস্কর্যের সৃষ্টি হয়েছিল। গথিক ভাস্কর্যের মূর্তিগুলিকে উঁচু দরজার সাথে সঙ্গতি রেখে লম্বা করে তৈরী করা হত। বস্তুতঃ এ মূর্তিগুলি ছিল প্রতীকধর্মী।

রঙিন কাঁচের জানালা

গথিক গীর্জার জানালাগুলি রঙিন ও চিত্রিত কাঁচ দিয়ে সাজান হত। রঙিন কাঁচের জানালা ছিল মধ্যযুগের ইউরোপের এক অনবদ্য শিল্পকলা। তের শতকের কারিগররা গলান কাঁচে গরম অবস্থায় রঙিন খনিজ পদার্থ মিশিয়ে রঙিন কাঁচ তৈরী করতেন। সীসার পাতের কাঠামোয় টুকরো টুকরো রঙিন কাঁচ বসিয়ে সুন্দর চিত্রিত জানালা তৈরী করা হত। এসব রঙিন জানালায় নানারকম দেবদেবীর ছবি অথবা কোন ঘটনার বিবরণমূলক ছবি থাকত। এ সকল রঙিন জানালার ছবি থেকে মধ্যযুগের জীবন যাত্রা সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারা যায়। রঙিন কাঁচের জানালা তৈরীর কৌশল বর্তমানে লোপ পেয়ে গেছে।

চিত্রকলা

মধ্যযুগের ইউরোপে চিত্রকলার খুব বেশী বিকাশ ঘটেনি। গীর্জার অভ্যন্তর ভাগকে সাধারণতঃ মূর্তি দিয়েই অলঙ্কৃত করা হত। দেয়াল চিত্র আঁকার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। গথিক গীর্জাগুলিতে বড় দেয়াল খুব বেশী ছিল না। তবে মধ্যযুগে হাতে লেখা বইয়ের ভিতরে সুন্দর রঙীন ছবি আঁকার প্রচলন ছিল। পুঁথির চিত্রায়ণ ও অলঙ্করণের মাধ্যমে ঐ যুগে চিত্রকলার কিছু বিকাশ ঘটেছিল।

www.pathagar.com

সঙ্গীত

মধ্যযুগের ইউরোপে গীর্জার প্রার্থনা সঙ্গীতকে অবলম্বন করে সঙ্গীত শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল, পাশাপাশি লোকায়ত সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের ধারাও অব্যাহত ছিল। লোকায়ত সঙ্গীতসমূহ বাদ্যযন্ত্র সহকারে এবং বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় গাওয়া হত। গীর্জায় সৃষ্ট সঙ্গীতের সাথে লোকায়ত সঙ্গীতের সম্মিলনের মাধ্যমে ইউরোপে এক অতি অপরূপ সঙ্গীতকলার জন্ম হয়।

মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা

খৃষ্টধর্মের মূল মন্ত্র হল বিশ্বাস; ধর্মযাজকগণ যা ব্যাখ্যা করেন তাতে সন্তুষ্ট চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রকৃত খৃষ্টানের কর্তব্য। যে ধর্ম বা দর্শনের প্রধান শিক্ষা বিশ্বাস, সেখানে বিজ্ঞান চর্চা বা জ্ঞানের অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। কাজেই খৃষ্ট ধর্মযাজকগণ গ্রীক বিজ্ঞান বা দর্শনের চর্চার উপর (যা তখনও অতি অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন—কেননা তা বিধর্মীদের অলস মস্তিষ্কের আবর্জনা মাত্র।

আর্চবিশপ থিওফেলাসের নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর একাংশ (গ্রীক বিজ্ঞান চর্চার ফল যেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে সঞ্চিত ছিল) ধ্বংস করা হল। এর কিছুকাল পরে বিদুষী গণিতজ্ঞ হাইপেসিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। খৃষ্টানদের এই ব্যাপক আক্রমণের ভয়ে বহু গ্রীক পণ্ডিত আলেকজান্দ্রিয়া পরিত্যাগ করে এথেন্সে প্লেটোর একাডেমীর দ্বারস্থ হলেন। কিছুদিন পরে সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের এক নির্দেশ দ্বারা প্লেটোর একাডেমীও বন্ধ করে দেয়া হল (৫২৯ খৃঃ) এবং সেই সঙ্গে সর্ব-প্রকার গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচার আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হল।

www.pathagar.com

এরপর শুরু হল কয়েক শতাব্দীব্যাপী তমসার যুগ। বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ, জ্ঞানের অনুশীলনের আর প্রয়োজন নেই; ধর্মজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। চার্চের ছত্রছায়ায় সারা পশ্চিম ইউরোপ এক অজ্ঞতার পরিমণ্ডলে নিমজ্জিত হল। মানুষের চেতনার দ্বার হল রুদ্ধ; কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামী, জঘন্য হীন যাদুবিদ্যা প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের নামে মানুষের অন্তরে শিকড় গেড়ে বসল। কয়েক শতাব্দীব্যাপী মধ্যযুগের মননশীলতার এটাই হল ইতিহাস।

এই চরম তমসার যুগে কোথাও কোথাও ক্ষীণ প্রদীপের শিখার মত জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত হতে দেখা গেছে। মধ্যযুগের মঠগুলিতে ধর্ম চর্চার প্রয়োজনেই কখনও কখনও জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন বা গণিতের চর্চা হয়েছে।

নবম শতাব্দীতে সম্রাট শার্লামেন তাঁর রাজধানী আচেন-এর রাজপ্রাসাদে যে স্কুল খুলেছিলেন, সেখানেও কিছু কিছু জ্ঞান চর্চা হয়েছে। রাজপরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে যে বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল তাতে সম্রাটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিতবর্গ সমবেত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের ইয়র্ক থেকে এসেছিলেন অ্যালকুইন, প্রাসাদ স্কুলের তিনি ছিলেন প্রধান পরিচালক। অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক জন স্কটাস এরিগেনা ও কবি ওয়ালাফ্রিড ষ্ট্র্যাবো। কিন্তু জ্ঞান চর্চার পরিব্যাপ্তি অতি ক্ষুদ্রস্থানে সীমিত থাকায় সারা ইউরোপ এর আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল।

দশম শতাব্দী থেকে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্র নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই আবার জ্ঞান চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কেবল সৎ কাহিনী ও নীতিকথা শুনিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব ছিল না; যাজকদের লিখতে পড়তে ও চিন্তা করতে শিখতে হত যাতে তাঁরা চার্চের যাবতীয় ঐহিক ও পারত্রিক দাবী-দাওয়ার কথা জোর গলায় প্রচার করতে পারে এবং লোক-জনকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমাবস্থায় গীর্জার নিজস্ব স্কুলগুলোতেই যাজকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এ স্কুলগুলোই স্ফীত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রাথমিকভাবে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় বলতে সাধারণতঃ কর্পোরেশন বা গিল্ডকেই বোঝাত। এগুলো ছিল কারিগরী গিল্ডদের মতই। এদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের ট্রেনিং দেয়া এবং শিক্ষকতার লাইসেন্স বা অনুমতি প্রদান করা।

পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি ব্যাপক অর্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কোন বিশ্ববিদ্যালয়টি সর্বাধিক পুরানো তা নিশ্চিত বলা কঠিন। সম্ভবতঃ স্যালারনো বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। দশম শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলতঃ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় বোলোনা ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় দুটি। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ এবং ইতালীর মণ্টপেলিয়ার, স্যালামান্যকা, রোম এবং নেপ্‌ল্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে জার্মানীতে গড়ে উঠল একে একে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাগ, ভিয়েনা, হাইডেলবার্গ, কলোন ইত্যাদি। এ ভাবে মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াল আশিতে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ দুটি মডেলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দক্ষিণ ইউরোপের, যথা সমগ্র ইতালী, স্পেন, এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হত সাধারণতঃ ছাত্রদের দ্বারা। ছাত্ররাই শিক্ষকদের নিযুক্ত করত। তাঁদের বেতন প্রদান করত, আবার কখনও কখনও অযোগ্য শিক্ষকদের জরিমানা এমন কি চাকুরীচ্যুত করত। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলতঃ আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হত। উত্তর ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে গঠিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও ধর্মশাস্ত্র এবং কলাবিদ্যাও শিক্ষা দেয়া হত। এক একটি বিষয়ের জন্য ছিল এক একটি ফ্যাকাল্টি। প্রতিটি ফ্যাকাল্টির কর্তা ছিলেন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি।

www.pathagar.com

তাঁকে বলা হল ডীন। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কতগুলি কলেজকে সংযুক্ত করা হত। এই কলেজগুলি ছিল সাধারণতঃ দরিদ্র ছাত্রদের বাস-স্থান। কালক্রমে উপলব্ধি করা হল যে সকল ছাত্রকে আবাসিক ভবন বা হষ্টেলে রাখলেই কেবল মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ও শৃঙ্খলা পুরোপুরিভাবে বজায় রাখা সম্ভব। কিন্তু পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ই শুধুমাত্র এই পদ্ধতি বহাল রাখে।

আধুনিককালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদিও অনেকটা মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত, তথাপি মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয় ছিল আধুনিক পাঠক্রম ও বিষয়ের থেকে অনেকাংশে পৃথক। ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন বিষয়ই মধ্যযুগে শিক্ষা দেয়া হত না। প্রাথমিক পর্যায়ে চার অথবা পাঁচ বছরে ছাত্রদের সাধারণতঃ তিনটি বিষয়ে (**Trivium**) পাঠ গ্রহণ করতে হত ; যথা : ব্যাকরণ, সাহিত্য তত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যা। সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে **Bachelor of Arts** ডিগ্রী দেয়া হত ; পরবর্তীতে তাকে তিন অথবা চার বৎসর **Master of Arts** ডিগ্রীলাভের জন্য অধ্যয়ন করতে হত। এ সময়ে তার পাঠ্যবিষয় ছিল চারটি (**quadrivium**) ; যথা : গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীত। অবশ্য গণিত বলতে বোঝাত শুধুমাত্র সংখ্যাতত্ত্ব এবং সঙ্গীত অর্থ ছিল ধ্বনির মূল বৈশিষ্ট্য।

এর পরবর্তী পর্যায়ে **Doctor** ডিগ্রী দেয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীর বিশেষ যোগ্যতার উপর গুরুত্ব দেয়া হত। প্রার্থী পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স অতিক্রম না করা পর্যন্ত এ ডিগ্রীলাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে এজন্য প্রার্থীকে প্রায় চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত গবেষণা করতে হত। মাষ্টার বা ডক্টর ডিগ্রীকে শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকাল ছিল ছাত্রদের জীবনের একটি বিশেষ কাল। ছাত্ররা ছিল বিভিন্ন দেশ ও শ্রেণী থেকে আগত। একজন ফরাসী অথবা জার্মান ছাত্রকে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য যেতে হত ইতালীর বালোনা অথবা পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তেমনি একজন ইংরেজ অথবা

www.pathagar.com

ইতালীয়ান ছাত্রকে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে যেতে হত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতি ও শ্রেণীগত বিভিন্নতা ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি করত চিন্তাধারার বিচ্ছিন্নতা এবং স্বভাব, কৃষ্টি ও ভাষাগত বিভিন্নতা। ছাত্রদের পাঠ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল মোটামুটি নিম্নরূপ :

একটি কক্ষে শিক্ষক বক্তৃতা করতেন মেঝে থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচুতে অবস্থিত প্লাটফরম থেকে। ছাত্ররা সারি সারি কাঠের বেঞ্চে বসে শিক্ষকের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করত। কাগজের প্রচলন না হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যেতনা। দুর্লভ প্রাচীন পুঁথির দুএকটি কপি ধনী ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ সংগ্রহ করতে পারলেও সাধারণ ছাত্রদের তা ছিল নাগালের বাইরে। মাঝে মাঝে ছাত্ররা শিক্ষকের বক্তৃতার সারাংশ মোমের পাতের উপর এক প্রকারে সূচালো কাঠির দ্বারা লিপিবদ্ধ করত। তথাপি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে পাঠ্যবিষয় মনে রাখতে হত। ক্লাশের শেষে ছাত্ররা শিক্ষক প্রদত্ত বক্তৃতার বিভিন্ন দিক নিয়ে পরস্পরের সাথে আলাপ আলোচনা করত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ছাত্রদের খেলাধুলা বা চিত্তবিনোদনের বিশেষ কোন সুযোগ ছিলনা। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী, কেউ কেউ আবার উচ্ছৃখল, পাঠে অমনোযোগী। অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত ধর্মদ্রোহিতার। ধর্মীয় অনুশাসনের কঠোরতা পালিত হওয়া সত্ত্বেও পোপ ও ধর্মযাজকগণ প্রায়শঃই ছাত্রদের মধ্যে খুঁজে পেতেন নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহীদের।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যা

বিজ্ঞান

মধ্যযুগের ইউরোপে বিজ্ঞান চিন্তার প্রসার খুব বেশী ঘটেনি। স্থবির অর্থনীতি ও গীর্জার কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং স্কলাসটিক দর্শন ছিল বিজ্ঞানের বিকাশের পরিপন্থী। প্রাচীন গ্রীসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ মধ্যযুগের প্রথম দিকে ইউরোপবাসীদের নিকট অজানা ছিল। বার শতকে গ্রীক ও আরবী গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করলে ইউরোপবাসীরা প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে পরিচিত হয়। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের অনেক রচনা প্রথমে মুসলমানরা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং পরে আরবী থেকে সেগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আবার, মধ্যযুগে মুসলমানরা গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার সাধন করেছিলেন সে সংক্রান্ত গ্রন্থও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চায় সহায়তা করেছিল। মুসলিম গণিতবিদদের রচনা দ্বারা উৎসাহিত হয়েই তের শতকে 'লিওনার্ড অব পিসা' নানা প্রকার গাণিতিক আবিষ্কার সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন।

মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপে কয়েকজন নতুন মৌলিক চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিকের উদয় ঘটেছিল ; এঁরা হলেন অ্যাডেলার্ড অব বাথ, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও রোজার বেকন।

অ্যাডেলার্ড অব বাথ খৃষ্টীয় বার শতকের প্রথমদিকে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্রপাত করেন। তিনি এরিষ্টটল বা অন্য কোন প্রামাণ্য সূত্রের উপর আস্থা রাখতে অস্বীকার করেন এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির পক্ষ সমর্থন করেন। বস্তুত, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ দুটো হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দুটো মূল অঙ্গ।

সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক তের শতকের প্রথম দিকে পবিত্র রোমান সম্রাট ছিলেন। তিনি নিজে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

তাঁর মূল অবদান ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দান। তিনি আরবী গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লিওনার্ড অফ পিসা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অর্থ সাহায্য প্রদান করতেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মৃতদেহ কেটে পরীক্ষা করার আইন প্রণয়ম করেন এবং নেপল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যার শাখাটি ছিল ইউরোপের একটি সেরা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়।

মধ্যযুগের একজন সেরা বিজ্ঞানী ছিলেন রোজার বেকন (আনুমানিক ১২১৪ ১২৯৪ খৃঃ)। তিনি আলোকবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর রচনা কয়েক শতাব্দী ধরে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর বিজ্ঞান চিন্তা। রোজার বেকন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম প্রবর্তক। তিনি বাস্তব জগৎকে পর্যবেক্ষণ করার ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জ্ঞানলাভের পদ্ধতি হিসাবে আরোহ (**Inductive**) পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্কলাসটিক চিন্তা পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। বেকন এরিষ্টটলের রচনা প্রভৃতিকে প্রামান্য বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নীরিক্ষা, আরোহ পদ্ধতি ইত্যাদি প্রক্রিয়া হল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পতিদ্ধর মূল স্তম্ভ স্বরূপ।

অবশ্য রোজার বেকন এসব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেননি। প্রাচীন গ্রীসেই এ সকল পদ্ধতি কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছিলে। কিন্তু রোজার বেকনের মৌলিকত্ব এবং কৃতিত্ব এখানে যে তিনি স্কলাস্‌টিক চিন্তার ক্রটি উন্মোচন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল নিয়ম ও পদ্ধতিগুলি তুলে ধরেছিলেন। রোজার বেকনের মুক্ত চিন্তা ও স্পষ্ট বক্তব্য পরবর্তী পণ্ডিতদের স্বচ্ছ ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে।

মধ্যযুগের ইউরোপে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কার কি ঘটেছিল এখানে আমরা তাই আলোচনা করলাম। আমরা দেখতে পেয়েছি যে মধ্যযুগের ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তার

www.pathagar.com

কারণও অবশ্য ছিল। সামন্ত যুগের স্থবির সমাজ, অর্থনীতি ও জীবনদর্শন বিজ্ঞানের বিকাশের অনুকূল ছিল না। মধ্যযুগের অবসানে যখন সামন্ত অর্থনীতি লোপ পেয়ে ধনতন্ত্রের উদয় ঘটল, তখনই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল। বস্তুতঃ মধ্যযুগের স্কলাসটিক দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের উদয় হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

মধ্যযুগের কারিগরীবিদ্যা

মধ্যযুগের ইউরোপে বিশেষ কোন কারিগরী আবিষ্কার ঘটেনি। তবে প্রাচীন গ্রীস, রোম, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের অনেক যান্ত্রিক আবিষ্কার মধ্যযুগের ইউরোপে গিয়ে পৌঁছেছিল। এ সকল কারিগরী কৌশলের প্রয়োগের ফলে মধ্যযুগের সামন্ত অর্থনীতিতে ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়েছিল। এ কারিগরী কৌশলসমূহের প্রবর্তনের ফলে কি ভাবে সামন্ত অর্থনীতির ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের উদয় ঘটেছিল, 'মানুষের ইতিহাসে'র পরবর্তী খণ্ডে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে আমরা শুধু মধ্যযুগের ইউরোপে কি কি কারিগরী ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রচলন হয়েছিল তার উল্লেখ করব।

মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনীতি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষি নির্ভর। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপে প্রাচীন যুগের কতগুলো যান্ত্রিক আবিষ্কার বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পানিকল (watermill) ও বায়ুকল (windmill)। পানিকলের ব্যবহার রোমান যুগেও ছিল। নদীর পানির স্রোতের সাহায্যে একটা বড় চাকাকে ঘোরানো হত এবং এ ঘূর্ণায়মান চাকার শক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালিয়ে গম ভাঙ্গানো হত বা অন্য কাজ করা হত। রোমান যুগে পানিকলের সংখ্যা ছিল খুব কম; কারণ, দাসেরাই সেখানে সব কাজ করত বলে যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন রোম সাম্রাজ্যে ছিল না।

www.pathagar.com

পানিকল ছাড়াও, ১১৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে ইউরোপে বায়ুকলের প্রসার ঘটে। বায়ুকল সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে পারস্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে প্রায় প্রতিটি ম্যানরেই একটা করে পানিকল বা বায়ুকল থাকত। এ সকল বায়ুকল বা পানিকলের সাহায্যে গমকল, করাতকল, কামার শালার বড় বড় হাঁপর প্রভৃতি চালানো হত। পানিকল এবং বায়ুকলকে তাই মধ্যযুগের যন্ত্র বলেই গণ্য করা যায়, যদিও প্রাচীনকালেই এদের আবিষ্কার ঘটেছিল।

ঘোড়ার নতুন ধরনের সাজ এবং লোহার খুরের প্রবর্তনের ফলে মধ্য-যুগের ইউরোপের অর্থনীতিতে গভীর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। রোমান যুগে ঘোড়ার গলায় যে ভাবে দড়ি বাঁধা হত তাতে শ্বাসনালীতে চাপ পড়ত বলে ঘোড়া ভারী মাল বা গাড়ীকে টানতে পারত না। এদিকে মধ্যযুগের চীনে ঘোড়ার নতুন সাজ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাতে ঘোড়ার কাঁধের উপর দিয়ে একটা বলয় পরানো হত। এর ফলে ঘোড়া অনেক ভারী বোঝা টানতে পারত। এমনি ভাবে ঘোড়ার লাঙলের প্রবর্তনও সম্ভব হয়েছিল। নতুন ঘোড়ার সাজের ফলেই পাকা সড়কে মালবাহী ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে মধ্যযুগের ইউরোপে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল।

ত্রয়োদশ শতকে চীন থেকে কম্পাস যন্ত্র ইউরোপে এসে পৌঁছানোর ফলে সমুদ্র যাত্রা সম্ভব হয়েছিল। এ সময়ে নতুন ধরনের হালও প্রবর্তিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপে যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলন হয়েছিল। তখন সব শহরেই 'টাওয়ার ক্লক' থাকত। পানিকল, বায়ুকল এবং যান্ত্রিক ঘড়ির মেরামতির কাজে নিয়োজিত কারিগররা ক্রমে যন্ত্র কৌশলের বিকাশের পথ উন্মোচন করে।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের বাণিজ্য

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে পশ্চিম ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের অবলুপ্তি ঘটে। বর্বরদের আক্রমণ রোমান সাম্রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দেয়।

স্বনির্ভর সামন্ত অর্থনীতিতে প্রতিটি ম্যানর নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করত। একটি ম্যানরের সাথে আরেকটি ম্যানরের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুযোগ বিশেষ ছিল না। অন্যদিকে রোমের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ভেঙ্গে পড়ে। মধ্যযুগের ইউরোপে ক্রুসেডের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন বিকাশ ঘটেনি। যদিও পূর্বদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য তার বিশাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, তথাপি পশ্চিম ইউরোপের সাথে তার বাণিজ্য যোগাযোগ ছিল অতিশয় ক্ষীণ। দশম শতাব্দী থেকে শহরগুলি গড়ে ওঠার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। শহরগুলিতে প্রস্তুত সামগ্রী বণিকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেত।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পথগুলি হস্তগত করা ছিল ক্রুসেডের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রুসেডের মাধ্যমে এই বাণিজ্য পথগুলি ইতালীর বণিকদের হাতে আসে। জেনোয়া, ভেনিস, পিসা, ও মিলানের সমৃদ্ধির কারণ তাদের বাণিজ্য। এ সকল শহরের বণিকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত আরব বণিকদের কাছ থেকে এবং সেগুলো পৌঁছে দিত ইউরোপের বন্দরে বন্দরে।

মধ্যযুগের ইউরোপের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মূলতঃ দুটি পথে পরিচালিত হত—স্থল পথ ও জল পথ। উভয় পথেই বাণিজ্য পরিচালনা ছিল কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল।

স্থল পথে বাণিজ্য পরিচালনার প্রধান অন্তরায় ছিল পথঘাট ও পরিবহণ

www.pathagar.com

ব্যবস্থার ত্রুটি। রোমান যুগে নির্মিত রাস্তাঘাট গুলি দীর্ঘদিনের অযত্নের ফলে ধ্বসে পড়েছিল। মধ্যযুগের রাস্তাঘাটগুলি ছিল প্রধানতঃ ম্যানরের মধ্য দিয়ে তৈরী কাঁচা পায়ে চলার পথ। রাস্তার দুদিকে খাদ না থাকার ফলে বর্ষাকালে সেগুলি ছিল কর্দমাক্ত এবং শুষ্ক মৌসুমে ছিল ধূলিপূর্ণ। উপরন্তু রাস্তার মধ্যে মধ্যে খানাখন্দক থাকার ফলে শকটগুলি গর্তে গিয়ে পড়ত। শকটভেঙ্গে মাল রাস্তায় পড়ে গেলে সেগুলি রাস্তার মালিকের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত; সেগুলি তুলে নেয়ার অধিকার শকট মালিকের ছিলনা। রাস্তার মালিকানা থাকত কোন না কোন জমিদারের। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা এ জন্যই অনেক সময় রাস্তা মেরামত করতনা, যদিও পথ ব্যবহারের জন্য বণিকদের কাছ থেকে টোল বা কর জমিদাররা ঠিকই আদায় করত।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে বণিককে প্রায়ই নদী বা খাল পেরুতে হত। নদীর উপর পুল খুব কমই নির্মিত হত। ফলে বণিককে নৌকা বা ফেরির সাহায্য নিতে হত। এ জন্যও প্রতি ক্ষেত্রে তাকে অর্থ ব্যয় করতে হত। পুল পেরুলেও খাজনা দিতে হত। এ ভাবে প্রতি পদক্ষেপে অর্থ ব্যয় করতে হত বলে বণিকেরা মালের দাম বাড়িয়ে সেটা পুষিয়ে নিত। এ জন্য প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের দামই ছিল চড়া—সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে।

মাল পরিবহণের জন্য সাধারণতঃ অশ্ব বা খচ্চর ব্যবহৃত হত। স্বল্প-বিত্তের বণিকেরা নিজের পিঠেই মাল বহন করত। পশুচালিত শকটের প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ইতালীতে। সেখানকার শহর কর্তৃপক্ষই রাস্তা-ঘাট চলাচলের উপযোগী করে রাখার চেষ্টা করত। পরবর্তীকালে ফ্রান্স ও জার্মানীতে শকটের প্রচলন হয়। যদিও রাস্তার মালিকেরই দায়িত্ব ছিল নিজের এলাকার রাস্তাঘাট চলাচলের উপযোগী রাখার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই সে দায়িত্ব পালন করত না। বরং অনেক সময় চার্চ এবং মঠগুলি সে দায়িত্ব কিছুটা পালন করত। দেশের সরকারের পক্ষ থেকেও অনেক সময় এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হত। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরী একবার এই মর্মে নির্দেশ জারী করে ছিলেন যে, পথগুলি

www.pathagar.com

এমনভাবে প্রশস্ত করতে হবে যাতে দুটি শকট অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে। পরবর্তীকালে রাস্তার দুই পাশের দুইশত ফুট এলাকার ঝোপ জঙ্গল কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। রাস্তাঘাটগুলি দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিরাপদ রাখাই ছিল এ নির্দেশের উদ্দেশ্য। সংঘবদ্ধ ব্যারন, ডাকাত, ভাড়াটে সৈন্যদল ও সাধারণ অপরাধীরা প্রায়ই বণিকদের উপর হামলা করত। মধ্যযুগের শেষের দিকে নিঃস্ব নাইটদের পেশাই ছিল পথের দু-ধারের ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে অতর্কিতে বণিকদের কাফেলার উপর আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব লুট করা। এ জন্য সাধারণতঃ বণিকেরা দলবদ্ধ-ভাবে ও সাথে সশস্ত্র রক্ষীদল নিয়ে চলাফেরা করত। দীর্ঘপথের মাঝে মাঝে সরাইখানা থাকলেও সেগুলি খুব নিরাপদ ছিল না। চার্চগুলির পক্ষ থেকে কিছু কিছু সরাইখানা স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে সাধারণতঃ বণিকরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সরাইখানা স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছিল।

বিপদসঙ্কুল ভাঙাচোরা পথঘাট, যানবাহনের অপ্রতুলতা ও অন্যান্য কারণে মধ্যযুগের বাণিজ্য স্বভাবতঃই শ্লথ গতিতে পরিচালিত হত। এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক শহর থেকে আরেক শহরে পণ্য নিয়ে যেতে সময় লাগত অনেক, ফলে পণ্য হয়ে উঠত মহার্ঘ। মধ্যযুগে নদী বা সমুদ্রপথে বাণিজ্য কষ্টকর হলেও স্থলপথ অপেক্ষা তা সহজতর ছিল।

মধ্যযুগে নদীপথে মাল পরিবহণের জন্য নৌকা বা বার্জ এবং সমুদ্রপথে জাহাজ ব্যবহৃত হত। ইতালী, জার্মানী ও ফ্রান্সের শহরগুলিতে নৌকা-মালিকদের (**keelman**) গিল্ড ছিল। সাধারণতঃ যে জমিদারের এলাকার সামনে দিয়ে নদী বয়ে যেত তিনি সে অঞ্চল দিয়ে চলাচলকারী নৌকা বা বার্জ থেকে কর আদায় করতেন। প্রায় প্রতি ছয় মাইল এলাকা পার হলেই কর দিতে হত। কিন্তু জমিদাররা যেহেতু তাদের এলাকার নদীপথ নৌ চলাচলের উপযোগী রাখত না সেহেতু পরবর্তীকালে বিভিন্ন শহরের নৌকা বা বার্জ মালিকদের সমিতিগুলি এ কর আদায়ের ভার নিয়ে নদীপথ ও পোতাশ্রয়গুলি নৌ চলাচলের উপযোগী করে তুলত।

সাধারণতঃ সমুদ্রপথে জাহাজগুলি উপকূলকে দৃষ্টি সীমার মধ্যে রেখে

www.pathagar.com

চলাচল করত। বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কেউ গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার ঝুঁকি নিত না। কেননা, তাতে দিকভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে কম্পাস প্রচলিত হওয়ার পরই কেবল মাত্র গভীর সমুদ্রে জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

সমুদ্রপথে প্রথম প্রথম হাল্কা ওজনের জাহাজ চলাচল করত। একাদশ শতাব্দীতে বিজয়ী উইলিয়াম ৩০ টন মাল বহনকারী জাহাজ নিয়ে ইংলণ্ডে পাড়ি জমান। তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময় অধিকাংশ বৃটিশ জাহাজ ২০০ টন মাল বহন করতে পারত। সবচেয়ে বড় জাহাজের মাল বহন ক্ষমতা ছিল ৩০০ টন। উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরের পোতাশ্রয়গুলি অগভীর থাকার ফলে সেখানকার তুলনায় ভূমধ্যসাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলি ছিল আকারে বড়। ক্রুসেডের সময় কোন কোন ভেনিসীয় জাহাজ খোলের মধ্যে ৫০০ টন ওজনের মাল বহন ছাড়াও পাটাতনের উপরে অতিরিক্ত ওজনের মাল বহন করত।

মধ্যযুগের জাহাজগুলি দাঁড়ের সাহায্যে চলত। বাতাস অনুকূল থাকলে পাল তুলে দেয়া হত। কোন কোন জাহাজে প্রায় দুশ জন দাঁড়ী থাকত। এ সমস্ত দাঁড়ীরা অধিকাংশই ছিল ক্রীতদাস। মধ্যযুগে ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হয়ে গেলেও জাহাজে দাঁড় টানার কাজে ক্রীতদাস নিয়োগ করা হত। তাদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হত; তাদের শিকল দিয়ে তক্তার সাথে বেঁধে রাখা হত। ভূমধ্যসাগরের জাহাজগুলিতে বণিকরা অনেক সময় নিজেরাই দাঁড় টেনে জাহাজ চালিয়ে নিত।

জাহাজে মাল পূর্ণ করার জন্য ভেনিসের বণিকরা বিশেষ কৌশল উদ্ভাবন করেছিল। খালগুলির দুই তীরে বিভিন্ন ধরনের মালের গুদাম সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত ছিল। যে জাহাজটি বাণিজ্যে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হত তাকে টেনে নিয়ে এক একটা গুদামের সামনে উপস্থিত করা হত। গুদাম থেকে সরাসরি সে জাহাজে মাল তোলা হত। জাহাজটি যখন গুদামের সারির শেষপ্রান্তে পৌঁছাত ততক্ষণে সেটি পুরোপুরি মালে ভরে যেত। এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ে সুশৃঙ্খলভাবে জাহাজে মাল তোলা সম্ভব হত।

www.pathagar.com

সমুদ্রপথে জাহাজে মাল পরিবহণে ঝুঁকিও কম ছিল না। জলদস্যুদের দ্বারা জাহাজগুলি প্রায়ই আক্রান্ত হত। সে জন্য জাহাজগুলি একসাথে সারিবদ্ধভাবে যাত্রা করত। সাথে থাকত অস্ত্রবাহী জাহাজ। নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তারা এ ভাবেই গড়ে তুলত। সমুদ্রের আবহাওয়া জাহাজ চলাচলের অনুকূল থাকলেই কেবল জাহাজ চালানো হত। মজার ব্যাপার হল, যে সমস্ত বন্দর নগরী নিজেদের জাহাজগুলিকে জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সদাসর্বদা সতর্ক থাকত তারাই আবার শত্রুদেশগুলির জাহাজের উপরে সুযোগ পেলেই আক্রমণ করত। কিন্তু এর ফলে কারও কোন উপকার হত না। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে এ উপলব্ধি জন্মাল যে জলদস্যুদের দমন করার জন্য সর্বাংশে চেষ্টা করা প্রয়োজন—অন্ততঃ নিজ নিজ সমুদ্র এলাকায়। অতঃপর ভেনিস নগর আড্রিয়াটিক সাগরের উপর তার দাবী স্থাপন করল এবং সেখানকার জলদস্যুদের সফলতার সাথে নির্মূল করল। জার্মানীর হেনসিয়াটিক লীগ উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরকে জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করল।

সমুদ্রে জলদস্যুদের অত্যাচার কমলেও জাহাজডুবির ভয় থেকেই গেল। বিশেষত, জাহাজডুবি সংক্রান্ত আইন ছিল অদ্ভুত। কোন জাহাজ ভেঙ্গে গেলে বা ডুবে গেলে অথবা কোন জাহাজ পথিমধ্যে অচল হয়ে গেলে সে জাহাজের সমস্ত মাল ঐ এলাকার উপকূলস্থ মালিকের প্রাপ্য বলে গণ্য হত। জমিদারের লোকজনেরা ইচ্ছা করেই এমনভাবে বাতিঘরগুলিকে স্থাপন করত যে নাবিকরা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে জাহাজডুবির কবলে পড়ত। অবশ্য পরবর্তীকালে এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে জাহাজ মালিকরা প্রতিবাদ জানায় এবং হেনসিয়াটিক লীগ এ রীতি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় যে ডুবে যাওয়া জাহাজের মাল তার নিজস্ব মালিকের নিকট ফেরৎ দিতে হবে।

সমুদ্রপথে যেহেতু কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না তাই সামুদ্রিক জাহাজগুলি বেশী বেশী করে মাল বহন করত। দিন দিন সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালে জাহাজে ঘোড়াও পরিবহণ

www.pathagar.com

করা হত। ঘোড়াগুলিকে জাহাজের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হত। সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও এটা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকি-পূর্ণ এবং সেই সাথে ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে দূর দূরান্ত থেকে মাল এসে যখন ইউরোপের বন্দরে ভিড়ত তখন স্বভাবতই সেটা হয়ে উঠত অত্যন্ত দামী।

মধ্যযুগের বিভিন্ন শহর বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। হেনসিয়াটিক লীগের অন্তর্ভুক্ত শহরগুলি রাশিয়া থেকে আনত চামড়া, শস্য, ফার, মোম ও চর্বির তৈরী মোমবাতি; নরওয়ে ও সুইডেন থেকে নিয়ে আসত লোহা, তামা, লবণযুক্ত মাছ ও মাংস; ডেনমার্ক থেকে অশ্ব ও গবাদি পশু এবং বাল্টিকের উপকূল অঞ্চল থেকে হেরিং মাছ। এর পরিবর্তে লীগ বিক্রয় করত শস্য, মদ, বিয়ার, লবণ, মশলা, বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট ধাতব দ্রব্য। ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর শহরগুলির অবস্থান ছিল হেনসিয়াটিক লীগ ও দক্ষিণ ইউরোপের শহরগুলির মধ্যস্থলে। উভয়ের সাথে তাদের বাণিজ্য চলত। তাদের নিজস্ব দক্ষতা ছিল উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র উৎপাদনে। ইতালীর শহরগুলি ব্যবসা করত প্রাচ্যদেশীয় সামগ্রী নিয়ে। আরব বণিকদের কাছ থেকে তারা কিনত প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে আনা বিভিন্ন ধরনের মশলা, যেমন, গোলমরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, আদা ইত্যাদি। এ ছাড়া তারা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী, যথা, হাতির দাঁতের নির্মিত দ্রব্যাদি, বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, মুক্তা, রঙ, রেশম, সাটিন ও মসলিন বস্ত্র, সুগন্ধি, কাঁচ ও চীনামাটির দ্রব্যাদি। ইউরোপের ধনীদের গৃহে বিলাস সামগ্রী তারাই পৌছে দিত। এ ছাড়া ভেনিসের নিজস্ব কাঁচ-শিল্প, মিলানের মেয়েদের টুপি ও ঘোড়ার জিন এবং ফ্লোরেন্সের পশমী বস্ত্র অত্যন্ত মাহার্ঘ পণ্য রূপে বিক্রীত হত।

হেনসিয়াটিক লীগ

মধ্যযুগের বণিকরা বিদেশী শহরগুলিতে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একতাবদ্ধ হয়ে সমিতি গঠন করত। একইভাবে

www.pathagar.com

কয়েকটি শহর দলবদ্ধ ভাবে সমিতি গঠন করে বিদেশী শহরে নিজেদের বণিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হত। এমনিভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্মানীর উত্তরের শহরগুলি কলোন, লিউবেক, ডানজিগ ও হামবুর্গকে সাথে নিয়ে 'হেনসিয়াটিক লীগ' (**Hanseatic League**) নামে একটি সংঘ গঠন করে। ক্রমশঃ লীগের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলে অন্যান্য নদী তীরস্থ শহরগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

হেনসিয়াটিক লীগ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তার স্থায়ী বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে তোলে। লণ্ডন, ব্রুজেস্ এবং রাশিয়ার নভোগরোদে এ ভাবে স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

জার্মান সরকার যেহেতু ছিল দুর্বল, হেনসিয়াটিক লীগ তার নিজস্ব নৌবাহিনী গড়ে তুলে নিজেদের বাণিজ্যকে জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। এই বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে লীগ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়। লীগের নিজস্ব প্রতিনিধি সভা ডায়েট সদস্য-শহরগুলির বাণিজ্যিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত। হেনসিয়াটিক লীগের সম্পদের উৎস ছিল বাল্টিক সাগরের মাছের একচেটিয়া বাণিজ্য এবং রাশিয়া, ইংলণ্ড ও নেদারল্যাণ্ড্স্-এর সাথে বাণিজ্য। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই লীগ ছিল বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিপতি এবং উত্তর ইউরোপের দেশগুলির একমাত্র যোগানদার।

বাণিজ্য মেলা

মধ্যযুগের সবচেয়ে বেশী মাল ক্রয়-বিক্রয় হত মেলাতে। বাৎসরিক মেলাগুলি ছিল মাল কেনা বেচার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। প্রায় প্রত্যেক বড় শহরেই মেলা বসত, তবে ফ্রান্সের শ্যাম্পেনের মেলার খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। সেখানকার স্থানীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেলার আয়োজন করা হত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকরা তাদের মাল নিয়ে এই মেলায় সমবেত হত ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এই মেলার

www.pathagar.com

গুরুত্ব ছিল এত বেশী যে কোন বিদেশী বণিক তার দায়িত্ব যথাযথ পালন না করলে বা চুক্তি ভঙ্গ করলে তাকে দলবল সমেত মেলা থেকে বহিষ্কার করা হত।

শ্যাম্পেন ছাড়াও জার্মানীর লাইপজিগ ও ফ্রাঙ্কফুর্টে, ইতালীর ভেনিস ও জেনোয়াতে, লেদারল্যাণ্ড্স্-এর ইপ্রেস্ ও লিলিতে, স্পেনের সেভিল্-এ এবং ইংলণ্ডের সেণ্ট আইভিসি-এ মেলা অনুষ্ঠিত হত। মেলাগুলি শুধুমাত্র মাল বিক্রয়ের কেন্দ্রই ছিল না। মেলায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোকজনের সমাবেশ পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানে সহায়তা করত। সমগ্র ইউরোপের বণিকদের মিলনকেন্দ্র এই মেলাগুলি শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থার বিস্তারের কাজেও সহায়তা করত। মেলাগুলি মুদ্রাভিত্তিক অর্থ-নীতি আবার চালু করেছে। মেলাগুলির মধ্য দিয়েই স্বনির্ভর ম্যানরগুলি ক্রমশঃ তাদের বিচ্ছিন্নতার গণ্ডী কাটিয়ে শহরগুলির সাথে একাত্ম হয়েছে।

শ্যাম্পেন শহরের মেলা প্রায় সমগ্র শহর জুড়ে অনুষ্ঠিত হত। প্রকাণ্ড হলঘরগুলি মেলার জন্যই বিশেষ ভাবে নির্মিত হত। এ ছাড়া তৈরী হত অনেক ছোটবড় মাল গুদাম। শ্যাম্পেন ছাড়া অন্যান্য শহরগুলিতে চক্রাকারে একের পর এক যে মেলা বসত সেগুলি সারা বছর ধরেই ইউরোপের বণিকদের ব্যতিব্যস্ত রাখত।

মেলা শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই বণিকরা তাদের মালসামগ্রী নিয়ে হাজির হত এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করত। প্রতিদিন ঘণ্টা বাজিয়ে মেলার আরম্ভ ও সমাপ্তি ঘোষণা করা হত; মধ্যবর্তী সময়ে মাল বেচাকেনা চলত। মেলার প্রথম দশদিন শুধুমাত্র পোশাক ও পশমী বস্ত্রের বিকিকিনি হত। পরবর্তী দশদিনে কেনাবেচা হত চামড়া এবং চামড়ার তৈরী দ্রব্যের। মাসের শেষ দশদিনে মাল ক্রয় বিক্রয় হত শুধুমাত্র ওজন ও পরিমাপ করে। মেলা শেষ হলেও বণিকদের পাঁচ দিন অতিরিক্ত সময় দেয়া হত তাদের অবশিষ্ট মালের তালিকা তৈরী করার জন্য এবং মেলার পৃষ্ঠপোষক জমিদারের প্রাপ্য খাজনা মেটানোর জন্য। মেলায় যে সকল দ্রব্য কেনা বেচা হত তা থেকে মধ্যযুগের ইউরোপের

www.pathagar.com

দ্রব্য সামগ্রীর একটা পরিচয় পাওয়া যায়: প্রাচ্য থেকে আনা লিনেন, রাশিয়া ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি থেকে আনা ফার, জার্মানীর লোহা ও চামড়ার তৈরী দ্রব্য এবং ফ্রান্স ও স্পেনের তৈরী বিভিন্ন ধরনের মদ।

মধ্যযুগের মেলাগুলিতে বণিকরা ছাড়াও আর এক ধরনের লোকের বিশেষ আধিপত্য ছিল। এরা হল পোদ্দার বা মুদ্রাবিনিময়কারী। এরা ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের মুদ্রা বিনিময় করত। মেলায় এরা একটা টেবিল ও বাক্স নিয়ে বসত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকরা তাদের নিজস্ব মুদ্রা নিয়ে এসে এদের কাছ থেকে প্রয়োজনমত মুদ্রা বিনিময় করে নিত। অনেকে আবার এ মুদ্রা বিনিময়কারীদের এদের কাছে নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব টাকা গচ্ছিত রাখত। অনেকে আবার এদের কাছে মূল্যবান মাল বন্ধক রেখে প্রয়োজন মত টাকা ধার নিত।

ইউরোপের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সূত্রপাত এই মেলাগুলিতেই প্রথমে ঘটে। ইতালীতে প্রথম হুণ্ডি (**Bill of Exchange**) প্রথার প্রচলন ঘটে মূল্যবান ধাতু পরিবহণের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য। পরে পোপের দালালরা সারা ইউরোপে এ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়। হুণ্ডি ব্যবস্থাটি মোটামুটি এ রকম: যদি মিলান শহরের 'ক' নামক ব্যক্তিটি ফ্লোরেন্সের 'খ' নামক ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিতে চায় এবং ফ্লোরেন্সের 'গ' ব্যক্তিটি যদি মিলানের 'ঘ' ব্যক্তিকে একই পরিমাণ অর্থ দিতে চায় তা হলে এ দুই শহরের মধ্যে টাকা পাঠানোর কোন প্রয়োজন হয় না। মিলান শহরের 'ক' একই শহরের 'ঘ' কে টাকা দেবে এবং ফ্লোরেন্সের 'গ' ঐ শহরেরই 'খ' কে টাকা দেবে। তাহলেই পুরো ব্যাপারটির ঠিকমত সমাধান হবে। ক্রমে নগদ টাকার পরিবর্তে চেকে টাকা প্রদানেরও প্রচলন ঘটে। আবার, যাদের কাছে বণিকরা টাকা গচ্ছিত রাখত তারা অনেক সময় এ টাকা অন্যকে আবার ধারও দিত। অবশ্য এর বিনিময়ে তারা সুদ হিসাবে কিছু লাভ করত। এ ভাবে ক্রমশঃ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিস্তৃতি ঘটে। ক্রমে ক্রমে ইনসিওরেন্স ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। মালগুলির নিরাপত্তার জন্যই ইনসিওর বা বীমা করা হত। এ ভাবে বণিকের মালের হেফাজতের দায়িত্ব তার নিজের কাঁধ থেকে অন্যদের উপরেও

www.pathagar.com

অর্পিত হয়।

এবারে সুদ প্রথা সম্বন্ধে কিছু কথা বলা আবশ্যক। মধ্যযুগে একমাত্র ইহুদীরাই টাকা ধার দিয়ে তার বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করত। ইউরোপের খৃষ্টান সম্প্রদায় সুদ গ্রহণ করাকে অধার্মিক কাজ বলে বিবেচনা করত। ইউরোপের গীর্জা সুদ গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ইহুদীরা সুদ গ্রহণ করত বলে তাদের ঘৃণার চক্ষে দেখা হত। মেলাতে ইহুদীদের উপর বাড়তি কর আরোপ করা হত।

কালক্রমে ব্যাবসা বাণিজ্যের বিস্তৃতির ফলে খৃষ্টানরাও ধর্মের বাধা প্রত্যক্ষভাবে অমান্য না করেও পরোক্ষভাবে সুদ গ্রহণের অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করে। এক হাজার টাকা ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজন ন'শ টাকা গ্রহণ করত এবং এ ভাবে সে আসল ও সুদ উভয়ই পরিশোধ করত। কখনও নির্দিষ্ট তারিখে ইচ্ছা করে ঋণ পরিশোধ না করে ঋণ গ্রহীতা জরিমানার ছদ্ম আবরণে সুদ প্রদান করত। এ ভাবে পরবর্তীকালে ইতালীর খৃষ্টানদের মধ্য থেকেই ব্যাঙ্কারদের আবির্ভাব ঘটে। ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবার বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার রূপে আবির্ভূত হয়। আধুনিক বন্ধকী দোকান গুলিতে প্রতীক চিহ্ন হিসাবে যে তিনটি সোনার গোলক রাখা হয় সেগুলি ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবারের অনুকরণে করা হয়ে থাকে। এই পরিবারটি ফ্লোরেন্সের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কেবল মাত্র ব্যাঙ্কার হিসাবেই পরিচিত ছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইহুদীদের ব্যাপকভাবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন থেকে বিতাড়নের ফলে ইউরোপের মহাজন শ্রেণীর পদগুলি ইতালীয়দের দখলে আসে। কালক্রমে রোমের পোপরাও নিজেদের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইতালীর ব্যাঙ্কারদেরই নিয়োগ করেন। মধ্যযুগে যদিও জেনোয়ার সেণ্ট জর্জ ব্যাঙ্কই ছিল একমাত্র বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য শহরেও কিছু কিছু ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছিল, তথাপি ফ্লোরেন্সের ব্যাঙ্ক পরিবারদেরই পোপরা সবচেয়ে বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

মধ্যযুগে সুদের হার ছিল অত্যন্ত চড়া। বাণিজ্য ও শিল্প বিনিয়োগের

www.pathagar.com

জন্য সুদের হার ছিল শতকরা পনেরো ভাগ অথবা তার চেয়ে বেশী। ব্যক্তিগত কারণে নেওয়া ঋণের জন্য সুদের হার ছিল অত্যন্ত বেশী ; কখনও শতকরা আশী এমনকি একশ ভাগ ছিল সুদের হার। শেষ পর্যন্ত চার্চকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এ ব্যাপারে গ্রহণ করতে হয়। যথা, ফ্রান্সিস্কান সন্ন্যাসী দল ব্যাঙ্কগুলির পাশাপাশি বন্ধকী দোকান খুলেছিল। সেখান থেকে দরিদ্র লোকজন জিনিষপত্র বাঁধা রেখে খুব কম হারের সুদে ব্যক্তিগত কারণে টাকা ধার করতে পারত।

বাণিজ্যপথ

মধ্যযুগের ইউরোপে হস্তশিল্প ও কারিগরি উৎপাদনের বিকাশ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইউরোপের নানা স্থানে নগর গড়ে উঠেছিল এ কথা আগেই বলা হয়েছে। আবার ব্যবসার প্রসার এবং নগরসমূহের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটার সাথে সাথে বাণিজ্য ও নগর একে অপরকে প্রভাবিত করতে থাকে। এর ফলে বাণিজ্য ও নগর উভয়েরই উন্নতি ঘটতে থাকে। এগার শতকে বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে নতুন বাণিজ্য পথের বিস্তার ঘটে।

ইতালীর ভেনিস নগরীর বণিকরা সপ্তম শতাব্দী থেকেই পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের নৌশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কনস্টান্টিনোপল ও এশিয়া মাইনরের সাথে ইতালীর বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ভেনিস নগরীর বিকাশের ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। পঞ্চম শতকে মধ্য ইউরোপের একদল লোক হুনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর উপকূলে কাদা-মাটিতে ঘেরা কতগুলি দ্বীপে আশ্রয় নেয়। ১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১১৭টি দ্বীপ নিয়ে ভেনিস শহরটি গড়ে ওঠে। প্রায় ৪০০ পুল দিয়ে এ দ্বীপগুলিকে যুক্ত করা হয়েছিল। ভেনিসের লোকেরা অবশ্য 'গণ্ডোলা' নৌকা দিয়েই যাতায়াত করে। প্রথমে ভেনিসের অধিবাসীরা লবণ তৈরীর ব্যবসা শুরু করেছিল। শত শত বছর ইউরোপের লবণের ব্যবসার উপর

www.pathagar.com

ভেনিসের ছিল একচেটিয়া অধিকার। ক্রমশঃ ভেনিস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে। বাণিজ্যের মাধ্যমে ভেনিস প্রভূত ধন ও ক্ষমতা অর্জন করে। এগার শতকের মধ্যেই ভেনিস একটি বিশাল বাণিজ্যিক নৌ-বহরের অধিকারী হয়েছিল। ১০০২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য পথটি মুসলমানদের হাত থেকে ভেনিসের কর্তৃত্বে চলে যায়।

ইতালীতে যে কেবলমাত্র ভেনিস নগরীর উদয় ঘটেছিল তা নয়। তার পাশাপাশি মধ্যযুগে মিলান, পিসা, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি ইতালীয় নগরও বাণিজ্যের মাধ্যমে বিকাশ ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ভেনিসের সাথে এ সব নগরীর তীব্র বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতাও চলত। ইতালীর এ সকল নগরীর বণিকরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে এবং মুসলমানদের সাথে বাণিজ্য করত। ইরাকের বাগদাদ, সিরিয়ার দামেস্ক, মিশরের কায়রো প্রভৃতি বিখ্যাত মুসলিম নগর ও বন্দরগুলির সাথে ইতালীর বণিকদের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রুসেডের পূর্ব পর্যন্ত ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি নগরীর বণিকরা বাইজেন্টাইন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত। ক্রুসেডের সময়ে ইতালীর বণিকদের কার্যকলাপ আরও বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ

মধ্যযুগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে প্রধানতঃ ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যকার বাণিজ্যকে বোঝান হয়। ইউরোপের বা ইতালীর বণিকরা সরাসরি পূর্ব-এশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রয়োজনীয় বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে আসত না। চীন, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে গোলমরিচ, আদা প্রভৃতি মশলাপাতি এবং নানাপ্রকার মূল্যবান ও বিলাসদ্রব্য প্রধানতঃ তিনটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ দিয়ে এসে জড়ো হত কনস্টান্টিনোপল, দামেস্ক, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি নগর ও বন্দরে। এ বাণিজ্যপথ-গুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন বাইজেন্টাইন সম্রাট ও আরব বণিকরা। আরব বণিকদের কাছ থেকে এশিয়ার মশলাপাতি ইতালীর বণিকরা কিনত দশগুণ দাম দিয়ে। ইতালীয় বণিকরা তারপর প্রাচ্যের পণ্যদ্রব্য ইউরোপের

www.pathagar.com

বিভিন্ন শহরে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করত। তাই দেখা যাবে যে এশিয়া থেকে ইউরোপে যে পণ্যদ্রব্য আসত সে বাণিজ্য পথগুলির উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল আরব বণিক ও বাইজেন্টাইন সম্রাটের। আর ইউরোপের আভ্যন্তরীণ বাজারে যে পথ ধরে এশিয়া ও প্রাচ্যের পণ্যসম্ভার যেত সে পথের উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল ইতালীর বণিকদের।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ

পনের শতক পর্যন্ত প্রধানতঃ তিনটি বাণিজ্যপথ দিয়ে প্রাচ্য তথা এশিয়ার পণ্যদ্রব্য ইউরোপে গিয়ে পৌঁছাত। এদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষিণের পথটি ছিল প্রধানত জলপথ। চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জলপথে এবং মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্থলপথে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রথমে এসে জড়ো হত ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল বা মালাবার উপকূলে। অতঃপর মালবার উপকূলের বাণিজ্য বন্দরসমূহ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে বাণিজ্য জাহাজসমূহ ভারত মহাসাগর দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হত এবং লোহিত সাগরের পশ্চিম প্রান্তে এসে থামত। সেখান থেকে উটের ক্যারাভানে করে এসব পণ্য নিয়ে যাওয়া হত কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায়।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথটি ছিল কিছুটা উত্তরে অবস্থিত। এটিও শুরু হয়েছিল মালাবার উপকূলে। সেখান থেকে জাহাজে করে পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়া হত আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের ভিতর দিয়ে। পারস্য উপসাগরের উত্তর প্রান্ত থেকে এ সকল বাণিজ্যসম্ভার উটের ক্যারাভানে কাফেলায় নিয়ে যাওয়া হত কৃষ্ণসাগরের তীরে বা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে।

তৃতীয় পথটি ছিল সবচেয়ে উত্তরের এবং এটি ছিল মূলত স্থলপথ। এ পথটি চীন থেকে শুরু করে গোবি মরুভূমি পার হয়ে সমরকন্দ, বোখারা প্রভৃতি মুসলিম নগরী পার হয়ে কাস্পিয়ান সাগরের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। এখান থেকে একটি শাখা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিয়ে অগ্রসর হয়ে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর হয়ে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছায়। তার থেকে আরেকটি শাখা বেরিয়ে আবার উত্তরে গিয়ে রাশিয়াতে পৌঁছেছিল।

www.pathagar.com

দেখা যাচ্ছে, এশিয়া থেকে ইউরোপের দিকে যে বাণিজ্য পথগুলি গিয়েছিল সেগুলি শেষ হত ভূমধ্যসাগরের ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলে। সেখান থেকে ইতালীয় বণিকরা পণ্য নিয়ে গিয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরে পাঠাতো।

ইউরোপের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ এবং কনষ্টান্টিনোপল থেকে ইতালীর বণিকরা জাহাজে করে পণ্য নিয়ে আসত ইতালীর বিভিন্ন বন্দরে ও নগরে। জার্মানীর বণিকরা আল্পস পর্বতের ব্রেনার গিরিপথ দিয়ে এ সকল পণ্য জার্মানীর নুরেমবার্গ, আউপ্‌স্‌বুর্গ, উল্‌ম্‌, রিজেন্সবার্গ প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যেত। আবার ইতালীর পো নদীর অববাহিকা দিয়ে এবং সেন্ট গোটহার্ড গিরিপথ দিয়ে বাণিজ্য সম্ভার যেত রাইন নদীর তীরবর্তী রাইনল্যাণ্ডে এবং বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে।

ভেনিসের বণিকরা অবশ্য প্রধানতঃ জলপথে বাণিজ্য করত। কনষ্টান্টিনোপল ও অন্যান্য বন্দর থেকে কেনা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এবং প্রাচ্যের পণ্যদ্রব্য নিয়ে ভেনিসের বাণিজ্যবহর জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে চলে যেত বেলজিয়ামের ব্রুজেস বন্দরে। এ বন্দরটি ছিল উত্তর পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র। ভেনিসের বণিকরা স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংল্যণ্ডেও যেত। জলপথে যেত বলে ভেনিসের বণিকদের মাল পরিবহণে খরচ হত কম। এরা জাহাজে করে নিয়ে যেত প্রাচ্যের মশলা-পাতি ও বিলাসদ্রব্য এবং ফেরার পথে পশ্চিম ইউরোপ থেকে নিয়ে আসত পশম, চামড়া, ধাতু প্রভৃতি। ইতালীতে এনে এ সকল কাঁচামাল দিয়ে তারা নানাপ্রকার মূল্যবান ও সৌখিন পণ্য তৈরী করত এবং সেগুলি প্রাচ্যে রপ্তানী করত।

ক্রমে বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরের বাণিজ্যপথও ভূমধ্যসাগরের মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। নর্মানদের বাণিজ্য সাম্রাজ্য দশম ও একাদশ শতকেই রাশিয়ার কিয়েভ ও নভোগরোদ থেকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বার শতকে এ বিশাল বাণিজ্য অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে

www.pathagar.com

ছিল বর্তমান ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের অন্তর্গত ফ্ল্যাণ্ডার্স অঞ্চল। এ অঞ্চলের সাথে সমুদ্রপথে এবং নদীপথে সমগ্র উত্তর ইউরোপ, মধ্য ইউরোপ ও ইতালীর যোগাযোগ ছিল। নর্মানরা নদীপথে বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত একটি বাণিজ্যপথ প্রতিষ্ঠা করেছিল; এ পথে তারা প্রাচ্যের পণ্য নিয়ে যেত। এটা তাই আশ্চর্য নয় যে বার তের শতকে ফ্রান্স-বেলজিয়ামের অন্তর্গত ফ্লাণ্ডার্স অঞ্চল এবং ইতালীর অন্তর্গত লম্বার্ডি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী নগর গড়ে উঠেছিল। লোম্বার্ডি অঞ্চল আল্প্‌স্ পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত হলেও, সিম্প্লন, সেণ্ট গোটহার্ড, বার্ণিনা এবং স্প্লুজেন গিরিপথ এ অঞ্চলকে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের সাথে যুক্ত করেছে। তাই ইতালীর সাথে বাকি ইউরোপের বাণিজ্য সংযোগ লম্বার্ডির উপর দিয়েই বিস্তৃত হয়েছিল। প্রাচ্য থেকে যে সব পণ্য সম্ভার ইতালীতে এসে জড়ো হত সেগুলো লম্বার্ডি অতিক্রম করে আল্প্‌স্-এর বিভিন্ন গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলে যেত ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের রোন নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, মধ্য ইউরোপের রাইন অববাহিকায় এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ডানিয়ুব অববাহিকায়। এ সময়ে নতুন করে রোমান আমলের প্রতিষ্ঠিত রাস্তা ও পথঘাটগুলি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তের-চোদ্দ শতকে তাই মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের স্থলপথে বণিকদের কাফেলা, নদীপথে বার্জ-এর বহর, ভূমধ্যসাগর, বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরে এবং ইংলিশ চ্যানেলে বাণিজ্য জাহাজের চলাচল—এ ছিল একটি অতি পরিচিত দৃশ্য। আর বণিকদের চলাচলের পথের উপর গড়ে উঠেছিল অজস্র নগর।

তের শতকে আন্তর্জাতিক ও ইউরোপের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের খৃষ্টান ধর্মযোদ্ধারা কনষ্টান্টিনোপল জয় করে সেখানে গ্রীক গীর্জার পরিবর্তে ল্যাটিন বা রোমান গীর্জা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এর পরে ফ্রান্সের রাজাও ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেন। এ সময়ে মার্সেই এবং বার্সেলোনা নগর দুটো এশিয়া মাইনরের সাথে বাণিজ্য শুরু করে। জার্মানীর অন্তর্গত প্রাশিয়া

www.pathagar.com

অঞ্চলের টিউটনিক নাইটরা পূর্ব দিকে বাল্টিক সাগরের তীরে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বিস্তৃত করে এবং লিবাউ, মেমেল ও রেভাল নামক বন্দর নগরী স্থাপন করে। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলরা রাশিয়ার কিয়েভ নগরকে ধ্বংস করলে কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরের মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথটি ভেঙ্গে যায়। এ সুযোগে রাশিয়ার নভোগরোদ নগরটি এস্তোনিয়া ও লাটভিয়ার বিভিন্ন বন্দরের সাথে এবং তাদের মাধ্যমে উত্তর জার্মানীর সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলরা বাগদাদ ধ্বংস করার পর এশিয়ার বাণিজ্যপথটি ভূমধ্যসাগরে আসার পরিবর্তে কৃষ্ণসাগরের তীরস্থ ট্রেবিজণ্ড-এ এসে শেষ হয়। সেখান থেকে কৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য সম্ভার কনষ্টান্টিনোপল-এ ও ভূমধ্যসাগরের দিকে প্রবাহিত হত। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে সিসিলি অধিকার কয়ার পর আরাগনের নগরগুলি ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীরা বাইজেন্টাইন সম্রাটকে পরাজিত করে কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করে। এশিয়ার যে সকল বাণিজ্য পথের উপর এতকাল বাইজেন্টাইন সম্রাট এবং আরব বণিকদের অধিকার বজায় ছিল, এখন অটোমান তুর্কীরা সে সব পথের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ অবস্থায়, কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের পরে প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের বাণিজ্যপথগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পূর্ব পশ্চিমের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ইউরোপীয়রা তখন ভারতবর্ষ ও চীনে যাওয়ার জন্য নতুন জলপথ খুঁজতে থাকে। এ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত ইতালীয় নাবিক কলম্বাস আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকা যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার করেন এবং পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডা গামা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার করেন। নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরাতন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথগুলি অবলুপ্ত হয়।

www.pathagar.com

বাইজেণ্টাইন সভ্যতা

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান সম্রাট কনষ্টানটাইন প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ বাইজেন্টিয়ামে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাটের নামের অনুকরণে নতুন রাজধানীর নামকরণ করা হল কনষ্টান্টিনোপল। কৃষ্ণসাগর ও মারমারা সাগরের মধ্যে সংযোজক প্রণালী বসফরাসের পশ্চিম তীরে অর্থাৎ ইউরোপীয় তীরে অবস্থিত কনষ্টান্টিনোপল বর্তমানে ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে এই কনষ্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য যখন আভ্যন্তরীণ গোলযোগে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত, তখন কনষ্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করেই টিকে ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা। রোমান সম্রাটদের বিলাসিতা, অত্যাচার ও নিপীড়ন, অর্থনৈতিক ভাঙ্গন, দাসবিদ্রোহ ও সম্রাটের করভারে জর্জরিত কৃষককুলের জমি থেকে উৎখাত হয়ে পলায়ন প্রভৃতির ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে উপনীত, ঠিক তখনই দলে দলে বিভিন্ন বর্বর জাতি একে একে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থান দখল করতে শুরু করল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। অন্যদিকে বহুদিন পর্যন্ত বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য টিকে রইল আশ্চর্যরূপে। কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য চিরকালের জন্য বিভক্ত হয়ে গেল। মূল কথা হল, পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটল। আর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকেও তখন আর রোমান সাম্রাজ্য বলা চলে না, কারণ সেখানে রোমান সভ্যতা অপেক্ষা গ্রীক সভ্যতারই প্রাধান্য ছিল বেশী। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর। এ দেশগুলি এক সময়ে ছিল গ্রীক উপনিবেশ। কাজেই নামে রোমান সাম্রাজ্য হলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ছিল প্রকৃতপক্ষে গ্রীক সভ্যতারই

www.pathagar.com

ধারক ও বাহক। ধর্মের দিক দিয়েও এটা ছিল গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের অন্তর্ভুক্ত। আর এর অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির মধ্যে গ্রীক প্রভাব ছিল সুপরিস্ফুট। তবে একথা মনে করা ভুল যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে গ্রীক সভ্যতার পুনরুত্থান ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে হেলেনীয় সভ্যতার পতনের পর কনষ্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করেই গ্রীক সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু টিকে ছিল।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি বিরাট অংশ ছিল এশিয়ার অন্তর্গত। ফলে স্বভাবতই প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতার প্রভাব এখানে পড়েছিল। বাইজেন্টাইন অধিবাসীদের মধ্যে ছিল পারসিক, ইহুদী, সিরীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক ও মিসরীয়। এ ছাড়াও স্লাভ ও মঙ্গোল জাতির একটি বড় অংশ এখানে বাস করত।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রথম দিকের ইতিহাস শুধুমাত্র বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্রায় দু'শ বছর ধরে বাইজেন্টাইন সম্রাটগণ সফলভাবে বৈদেশিক আক্রমণ ঠেকিয়ে এসেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল বাইজেন্টাইনের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন। কনষ্টান্টিনোপলের ভৌগোলিক অবস্থান একে করে তুলেছিল দুর্ভেদ্য। তিনদিকে সমুদ্র ও অন্যদিকে উঁচু ও সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এই নগরী সর্বদা নিজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এসেছে। এ ছাড়া রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালীর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলেও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হয়নি। পূর্বের মতই অপ্রতিহত গতিতে কনষ্টান্টিনোপল ও অন্যান্য বন্দরগুলি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে গেছে। উপরন্তু, এই বাণিজ্যের ফলেই রাজকোষ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিপুল অর্থে, যার দ্বারা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল বিরাট সামরিক বাহিনী। এই সামরিক সাফল্যই সম্রাট জাষ্টিনিয়ানকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য জয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

জাষ্টিনিয়ানের প্রধান পরিকল্পনা ছিল বর্বরদের দ্বারা অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করা। তাঁর প্রথম অভিযান প্রেরিত

www.pathagar.com

হয়েছিল উত্তর আফ্রিকার ভ্যাণ্ডাল রাজ্যের বিরুদ্ধে। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকার জলবায়ুর প্রভাবে ও প্রাচীন পিউনিক জাতির সংস্পর্শে এসে অনেক আগেই তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। তারা এর আগে সেখানে কোনমতে একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিল কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন সভ্যতা গড়ে তুলতে পারেনি। ভ্যাণ্ডাল রাজা জেলিমার-এর নৌবাহিনীর প্রধান অংশ ও সেনাবাহিনীর একটি অংশ ইতালীর সার্ডিনিয়াতে (এটা ভ্যাণ্ডাল রাজ্যের অংশ ছিল) বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হয়েছিল। জাষ্টিনিয়ানের সেনাপতি বেলিসারিয়াস এই সুযোগে তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে কার্থেজ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কার্থেজে পৌছানোর পর সেখানকার ক্যাথলিক ও রোমান জনগণ তাঁকে স্বাগত জানায়। ভ্যাণ্ডাল রাজা তাঁকে বিশেষ বাধা দিতে পারেননি। বেলিসারিয়াস দুটি যুদ্ধে ভ্যাণ্ডাল রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও ধ্বংস করেন। সকল ভ্যাণ্ডাল নেতাদের নির্বাসিত করা হয়। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্য এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ক্রীতদাস বানান হয়। রোমান ও ক্যাথলিকদের সেখানে পুনর্বাসিত করা হয়। এর পরে জাষ্টিনিয়ানের দৃষ্টি ইতালীর প্রতি নিবদ্ধ হল। সেখানকার অষ্ট্রোগথ রাজার প্রতি জাষ্টিনিয়ানের নির্দেশ প্রেরিত হল যে অষ্ট্রোগথদের বাইজেণ্টাইন সম্রাটকে বাৎসরিক কর দিতে হবে, বাই-জেণ্টাইন সেনাবাহিনীর জন্য তিন হাজার গথ সৈন্য পাঠাতে হবে, ক্যাথলিক চার্চকে গথদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দিতে হবে, সিনেটের সকল সদস্যের নিযুক্তি দেবেন বাইজেণ্টাইন সম্রাট এবং গথ রাজ্যকে বাইজেণ্টাইন সম্রাটের আনুগত্য মেনে নিতে হবে।

নিরুপায় গথ রাজা জাষ্টিনিয়ানের সাথে যখন আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত তখন সেনানায়ক বেলিসারিয়াস গথরাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ৫৩৬ খৃষ্টাব্দে নেপলস অধিকার করেন, পরে রোম শহরও অধিকার করে নেন। গথরা কুড়ি বছর ধরে বাইজেণ্টাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে অবশেষে নেপলস (৫৪৩ খৃঃ) ও রোম (৫৪৬ খৃঃ) পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু সর্বশেষে ট্যাজিনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওয়ার পরে

www.pathagar.com

(৫৫২ খৃঃ) তাদের সকল শক্তির অবসান ঘটে।

জাষ্টিনিয়ানের সর্বশেষ অভিযান ছিল স্পেনের ভিসিগথদের বিরুদ্ধে। ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে জাষ্টিনিয়ান স্পেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ক্রমে ক্রমে সেভিল, মালাগা, কার্থাজেনা ও কর্ডোভা শহরগুলি অধিকার করে নেন।

পশ্চিমের অভিযানের সাফল্য জাষ্টিনিয়ানের পূর্বদিকের রাজ্যগুলির জন্য প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে। জাষ্টিনিয়ানের রাজ্যের পূর্বাংশে ছিল বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য। সাসানী রাজবংশের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটপ্রথম খসরু (৫৩১-৫৭৯ খৃঃ) তখন পারস্য সম্রাট।

জাষ্টিনিয়ান যখন পশ্চিম অভিযানে ব্যস্ত, তখন পারস্য সম্রাট একে একে জাষ্টিনিয়ানের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দারা, সিরিয়া ও এন্টিওক দখল করে নেয়। একইভাবে জাষ্টিনিয়নের দুর্বলতার সুযোগে তাঁর বল্কান উপদ্বীপ এলাকায় অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে স্লাভ, বুলগেরিয়ান ও অ্যাভারদের।

প্রকৃত পক্ষে জাষ্টিনিয়ানের উচিত ছিল পশ্চিম অভিযানে নিয়োজিত না হয়ে তাঁর পূর্ব সাম্রাজ্য ও বল্কান উপদ্বীপ রক্ষা করা। তাঁর অধিকৃত পশ্চিমের রাজ্যগুলিও বেশীদিন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর ইতালী লম্বার্ডদের হাতে এবং উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন মুসলমানদের দখলে চলে যায়। উপরন্তু, বিপুল সামরিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য তিনি প্রজাদের উপর যে বিপুল করের বোঝা চাপিয়ে দেন তার ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এতে উভয় সাম্রাজ্যই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আরবদের আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেয়। অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের আক্রমণে একমাত্র এশিয়া মাইনর ছাড়া বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের এশিয়াস্থ বাকি অংশটুকু হাতছাড়া হয়ে যায়। আরবদের শক্তিতে ভাঁটা পড়লে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য আবার তার শক্তি সঞ্চয় করে এবং সিরিয়া, ক্রীট, ইতালীর উপকূলস্থ অঞ্চলগুলি ও বল্কান উপদ্বীপের কিছু অংশ পুনরায় উদ্ধার করে নিতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগ স্থলে অবস্থিত কনষ্টান্টিনোপল ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সর্বপ্রধান বাণিজ্য বন্দর। সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান নতুন নতুন বাণিজ্যপথ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু পারস্যের উপর দিয়ে যাতে বাণিজ্যপথ তৈরী না হয়, জাষ্টিনিয়ান সেদিকে বিশেষ নজর দেন। তার ফলে দূর প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কনষ্টান্টিনোপলকেই উপযুক্ত স্থানরূপে নির্বাচন করা হয়। উত্তরে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় অঞ্চল, পশ্চিমে ইংলণ্ড ও স্পেন, পূর্বে চীন ও দক্ষিণে আরব উপদ্বীপ—সকল দেশের সাথেই কনষ্টান্টিনোপলের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। কনষ্টান্টিনোপলের বণিকরা দক্ষিণ দিকে সিরিয়ার সমুদ্রোপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমে ক্রমে লোহিত সাগর ও মিসর অতিক্রম করে পূর্ব দিকে যাত্রা করত। আরেকদল স্থলপথে মেসোপটেমিয়ার উপর দিয়ে, তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা অতিক্রম করে পারস্য উপসাগর পার হয়ে দূর প্রাচ্যে যাত্রা করত। অন্যদল আবার উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চল ছাড়িয়ে বাল্টিক সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছাতো। আরেক দল পশ্চিমদিকে ফ্রান্সের মার্সেই, বোর্দো, অর্লি প্রভৃতি বন্দর ছাড়িয়ে আরও অভ্যন্তরে পশ্চিম ইউরোপের দিকে অগ্রসর হত। চতুর্দিকে এই বাণিজ্যপথগুলিকে প্রহরা দিত বাইজেণ্টাইনের বিশাল রাজকীয় নৌবাহিনী, যার ফলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য অপ্রতিহত গতিতে পৃথিবীব্যাপী তার বাণিজ্যাভিযান চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। বাইজেণ্টাইনের এই বিপুল নৌবাহিনীর প্রহরার ফলেই বহুদিন পর্যন্ত বাণিজ্যপথগুলি আরবদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এই বাণিজ্যপথগুলি দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে দ্রব্য-সামগ্রী এসে জমা হত কনষ্টান্টিনোপলের বন্দরে। চীন ও ভারত থেকে আসত রেশম, মূল্যবান পাথর, সুগন্ধী দ্রব্য, রঙ, মশলা, কারুকার্যখচিত বস্ত্রাদি ও ঔষধপত্র; উত্তর ইউরোপ থেকে ফার, চামড়া, অশ্ব, শন, মোম

www.pathagar.com

ইত্যাদি; আরব দেশগুলি ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসত মূল্যবান কাঠ, কার্পেট, কারুকার্যখচিত বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধাতব দ্রব্য। মিসর থেকে আসত শস্যাদি। এ ভাবে বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট পণ্যে কনষ্টান্টিনোপলের বন্দর ভরে যেত। কিছু পরিমাণ আমদানী দ্রব্য, বিশেষত: বিলাস দ্রব্য আবার পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে রাপ্তনী করা হত। এ ভাবে সংগৃহীত হত প্রচুর অর্থ। কনষ্টান্টিনোপল ছাড়াও বিখ্যাত বাইজেণ্টাইন নগর ও বন্দরসমূহ—আলেকজান্দ্রিয়া, এন্টিওক, স্যালোনিকা, দামেস্ক, টায়ার প্রভৃতি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সে যুগে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় একমাত্র বাইজেণ্টাইন মুদ্রারই প্রচলন ছিল, আর পশ্চিম ইউরোপের ফ্রাঙ্কদের সম্রাটরা বাইজেণ্টাইন মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা তৈরী করতেন। প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে বাইজেণ্টাইনের বণিকরা মহাজনীবৃত্তি গ্রহণ করে অন্যদের টাকা ধার দিতে শুরু করে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বহুলাংশে বিদেশীদের হাতে চলে যায় এবং এটা পরে বাইজেণ্টাইনের বাণিজ্যের তথা সমগ্র সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বহির্বাণিজ্যে বাইজেন্টিয়ামের খ্যাতি ছিল যেমন জগৎব্যাপী তেমনি আভ্যন্তরীণ শিল্প ও বাণিজ্যেও এর কোন জুড়ি ছিল না। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্পের প্রসারের অন্যতম কারণ এর বিপুল খনিজ সম্পদ। খনিজ সমৃদ্ধ বল্কানের পার্বত্যাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হত প্রচুর লোহা, তামা ও সীসা। এ গুলোর সাহায্যে প্রস্তুত হত যুদ্ধাস্ত্র ও বর্মরাজি। এ ছাড়া সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হত কারুকার্যময় সুন্দর সুন্দর বিলাসদ্রব্য প্রস্তুতের কাজে, আর হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদির ব্যবহারও বহুল প্রচলিত ছিল। রেশম বস্ত্র নির্মাণে বাইজেণ্টাইনের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত সুতী ও রেশম বস্ত্র অনেক সময় সূক্ষ্ম স্বর্ণ ও রোপ্যের কারুকার্যে অলঙ্কৃত থাকত। এ সব বিলাস দ্রব্যের বিপুল চাহিদা ছিল সমাজের উঁচু তলার নাগরিকদের কাছে, বিশেষত: সম্রাটের রাজদরবারে ও তাঁর পাত্রমিত্র অমাত্যবর্গের নিকট।

www.pathagar.com

শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে বাইজেন্টিয়ামের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। প্রত্যেক শিল্পের জন্য ছিল এক-একটি গিল্ড, যার হাতে ছিল সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে, প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের অধীনে। বাইজেন্টাইন সম্রাটের ক্ষমতা ছিল একচ্ছত্র। তাঁর অধীনস্থ বিরাট আমলাতন্ত্র সকল সরকারী কার্যের তদারক করত। শিল্পোৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করত। জিনিষপত্রের দাম, এমন কি শ্রমিকের মজুরী পর্যন্ত নির্ধারণ করত সরকার। কারখানার মালিকের কোন স্বাধীনতা ছিল না—কি পরিমাণ কাঁচমাল ক্রয় করা হবে, কতখানি দ্রব্য উৎপাদন করা হবে এবং কোথায় কি ভাবে বিক্রী করা হবে—সবই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। এমন কি, অনেক সময়ে একজন শ্রমিক ইচ্ছামত নিজের পেশা বেছে নিতে পারত না, সেটাও গিল্ডের দ্বারা নির্ধারিত হত। অনেক শিল্পও আবার সরকার কর্তৃক পরিচালিত হত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিউরেক্স (রক্ত-বেগুনী রঙ প্রদানকারী) মাছের চাষ, খনি, অস্ত্রনির্মাণ কারখানা ও বয়নশিল্প প্রভৃতি। এক সময়ে রেশমশিল্পও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়; কিন্তু চাহিদামত উপযুক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম না হওয়ায় পুনরায় তা ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রত্যর্পণ করা হয়।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে রোমের মত ব্যাপক ভিত্তিক দাসতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। রোমে যে সব কাজ দাসেরা করত, বাইজেন্টাইনে তা করা হত পানিস্রোত চালিত কলের সাহায্যে।

বাইজেন্টিয়ামের অর্থনীতি প্রধানতঃ শিল্পভিত্তিক হলেও সেখানে কৃষিরও প্রাধান্য ছিল। সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় কৃষিকার্য ছিল মোটামুটি স্বাধীন কৃষকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে; কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন কৃষকরা লোপ পেতে থাকে। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পর পর কয়েকবার ফসল নষ্ট হওয়ায় এই সমস্ত কৃষকদের স্থলে আবির্ভাব হয় ভূমিদাসের। পশ্চিম ইউরোপের মত ক্রমে ক্রমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেও সামন্তপ্রথা শিকড় গেড়ে বসে। সরকারও এই ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করে। পঞ্চম

www.pathagar.com

শতাব্দীতে সম্রাট আনাস্তাসিয়াস এক আইন জারী করেন যার দ্বারা কোন কৃষক একটি জমিতে ত্রিশ বছর বাস করলে তার পক্ষে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করা নিষিদ্ধ করা হয়। এ ভাবে কৃষকদের জমির সাথে বেঁধে ফেলা হল। এ ছাড়াও নানারূপ কর ধার্য করে স্বাধীন কৃষকদের একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হল। সম্রাটের এ সকল আইন জারীর উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছরে জমি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফল হল স্বাধীন কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করা এবং সমাজের পরগাছা রূপে একটি ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা যারা অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করে জীবন অতিবাহিত করত।

কৃষকরা ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ করে। এর মধ্যে টমাস-এর নেতৃত্বে সংঘটিত ৮২১ সালের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহে কৃষক ছাড়াও শহরের শ্রমজীবী জনগণের কিছু অংশ যোগদান করে। সরকারী সৈন্যের সাহায্যে এ বিদ্রোহ দমনের পর সামন্ত প্রভুরা সৈন্যদের মধ্যে জমি বিতরণ করে নিজেরা সৈন্য মোতায়েন করে রাখতে শুরু করে। এ ছাড়াও সম্রাটের সেনাবাহিনীতে সামন্ত প্রভুরা উচ্চপদ দখল করে রাখত। ফলে এরা সম্রাটের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। সম্রাটও নিজের ক্ষমতা হারিয়ে ক্রমে ক্রমে সামন্ত প্রভুদের অনুগ্রহভাজনে পরিণত হলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে রোমান সাম্রাজ্যের মত সংগঠিত দাসপ্রথা ছিল না। সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক দাস ছিল, কিন্তু তারা ছিল প্রধানতঃ কৃষিকার্যে ও গৃহকর্মে নিযুক্ত। সপ্তম শতাব্দীতে স্লাভদের আক্রমণের পর থেকে ক্রমশঃ দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। স্লাভরা প্রথমে বল্কান উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল অধিকার করে এবং পরে মেসিডোনিয়া ও গ্রীসে প্রবেশ করে ঈজিয়ান সাগরের উপকূল পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে। স্লাভদের আক্রমণে এ সকল অঞ্চলের দাস মালিকদের সম্পত্তি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে বহুক্ষেত্রে দাসরা মুক্ত হয়ে তাদের মালিকদের জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে

www.pathagar.com

নেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দাস মালিকরা নিজেরাই দাসদের মুক্ত করে দিয়ে তাদের মধ্যে জমি বিতরণ করে তাদের ভূমিদাসে পরিণত করে। এ ভাবে দাসপ্রথা ক্রমশঃ অবলুপ্ত হতে থাকে এবং দাসরা অর্ধ স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাসে পরিণত হয়।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আরেকটি শক্তি ছিল এর চার্চ, মঠ ও পুরোহিত গোষ্ঠী। এ সমস্ত পুরোহিতদের অধীনে ছিল প্রচুর জমি। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরোহিতদল তাদের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করত। এ ছাড়া নানারূপ দুর্যোগ দুর্বিপাকে সাধারণ লোকেরা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঈশ্বর সাধনায় তাদের সব কিছু উৎসর্গ করে চার্চ ও মঠকে তাদের সমস্ত জমিজমা দান করত। কিন্তু এদের দিয়েই আবার পুরোহিত দল সে জমি চাষ করাত। এ সমস্ত চার্চ ও মঠগুলি বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করত। জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ এদের হস্তগত হত। এ ছাড়াও পুরোহিতদল বিভিন্ন উপায়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করে নাগরিকদের একটি বিরাট অংশকে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য পেশা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাত। এর ফলে দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

বাইজেন্টাইন সমাজে পরস্পরবিরোধী উপাদানের প্রাবল্য বর্তমান ছিল। সেখানে ছিল একদিকে বিপুল ধন-বৈভব ও অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য; একদিকে জ্ঞানের অপার বিস্তার ও অন্যদিকে বিরাট অজ্ঞতা; একদিকে প্রবল ন্যায় নিষ্ঠা এবং পার্থিব জগতের প্রতি সকল বৈরাগ্য ও অন্যদিকে চরম অনৈতিকতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও জগতের সকল সুখ-সম্ভোগের প্রতি একান্ত অনুরাগ।

বাইজেন্টাইন সম্রাট ও তাঁর পারিষদবর্গ, ধনী সামন্তপ্রভুর দল, উচ্চ-শ্রেণীর পুরোহিতগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণী বাস করত বিপুল বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে। তাদের প্রাসাদোপম বাসগৃহ, কারুকার্যখচিত বহু মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ, উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য-পানীয়, চিত্ত বিনোদনের বিপুল উপকরণ প্রভৃতি দেখে বিস্মিত হতে হয়। এদের সময় কাটত কাব্য ও

www.pathagar.com

শিল্পকলার চর্চা করে এবং দুরূহ ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করে। কিন্তু ধনসম্পদের প্রাচুর্য এদের নৈতিক জীবনের অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল অলসতা ও কর্মবিমুখতা, যার ফল হয়েছিল পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও নিরন্তর গৃহযুদ্ধ।

এদেরই পাশাপাশি বাস করত আরেকটি শ্রেণী—বাইজেণ্টাইনের অগণিত দরিদ্র শহরবাসী, শ্রমিক ও কৃষক। আকণ্ঠ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়ে এরা বেঁচে থাকত ছিন্নমলিন বস্ত্র পরিধান করে; অর্ধাহারে, অনাহারে, মনুষ্যবাসের অনুপযোগী আলো বাতাসহীন ক্ষুদ্র কুটিরে অথবা উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাস করে; শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে। বাইজেণ্টাইনের বিপুল সম্পদ এদের কোন ভোগেই আসত না।

এই দুই শ্রেণীর জনগণের সমন্বয়ে গঠিত ছিল বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য। রাষ্ট্রীয় খরচে প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরী হয়েছিল বিরাট বিরাট মল্লমঞ্চ। সেখানে আয়োজন করা হত মল্লযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, পশুর সাথে যুদ্ধ প্রভৃতির, যা শেষ পর্যন্ত পরিণত হত লাল ও সাদা, নীল ও সবুজ প্রভৃতি স্মারক চিহ্ন সম্বলিত বিভিন্ন গোত্রের লোকের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায়। আর দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিলে বাইজেণ্টাইন সম্রাট জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রায়ই 'বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য' যুদ্ধের আহ্বান করতেন।

বাইজেণ্টাইন সভ্যতার অবদান

ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও আইন

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বাইজেণ্টাইনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়েছে, শিল্পকলার চর্চা হয়েছে। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি যখন বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য তার জ্ঞান প্রদীপের শিখা প্রজ্বলিত করে রেখেছিল। যখন পশ্চিম

www.pathagar.com

ইউরোপের মঠগুলিতে কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তখন কনষ্টান্টিনোপলের বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে। সে যুগে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচর্যা হয়েছে। আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানকার কিছু সংখ্যক গ্রীক পণ্ডিত এথেন্স ও কনষ্টান্টিনোপলে পালিয়ে যান। কিছুদিন পরে এথেন্সের বিদ্যাপীঠও বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন সমগ্র ইউরোপে কনষ্টান্টিনোপ্‌ল্‌ই ছিল জ্ঞানচর্চার একমাত্র কেন্দ্র।

বাইজেন্টাইনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল প্রাচীন গ্রীক মনীষীদের অমূল্য গ্রন্থসমূহ। সরকারী কাজে এবং সকল স্তরে গ্রীক ভাষার ব্যবহার জনগণকে গ্রীক সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। জ্ঞানের প্রতি বাইজেন্টাইনের জনগণের একটি স্বাভাবিক স্পৃহা ছিল। আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী প্রত্যেক পিতামাতাই তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় বাইজেন্টাইন পণ্ডিতদের নিজেদের অবদান বিশেষ কিছু ছিল না। তাঁদের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল গ্রীক পণ্ডিতদের রচনা সংকলন ও সংরক্ষণে। এঁদের মধ্যে প্রোসোপিয়াস, ফটিয়াস, সেলাস, সাইমন মেটাফ্রাস্টাস ও এরেথাসের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অবদান ছিল ইতিহাসে, সাহিত্যে ও দর্শনে।

বাইজেন্টাইনের পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যায় তিনি হলেন ঐতিহাসিক প্রোসোপিয়াস। প্রোসোপিয়াস ছিলেন সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের সমসাময়িক ও জাষ্টিনিয়ানের প্রধান সেনাপতি বেলিসারিয়াসের একান্ত একান্ত সচিব। বেলিসারিয়াসের অনেক সামরিক অভিযানে, বিশেষত পারস্য, আফ্রিকা ও ইতালী অভিযানে তিনি সঙ্গী হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর রচনায় এ সকল অভিযানের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রোসোপিয়াসের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন ফটিয়াস (৮২০-৮৯১ খৃঃ)। তাঁর কৃতিত্ব ছিল সাহিত্যে। সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠতম। শুধু তাই নয়, প্রাচীন লেখকদের রচনা সংকলনেও তাঁর অবদান ছিল প্রচুর। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **Bibliotheca** বা **Myriobiblon** প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত ২৮০টি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। ফটিয়াসের সংকলনের ফলেই আমরা মেমনন্, কনন, টেসিয়াস, ডায়োডোরাস, সিকুলাস ও এরিয়ানের রচনার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করি, কারণ এ সকল প্রাচীন লেখকদের প্রায় সমস্ত রচনায়ই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

একাদশ শতাব্দীর মাইকেল কনষ্টানটাইন সেলাস ছিলেন একাধারে দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। কনষ্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সেলাসের রচনায় দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিবরণ-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক রচনার জন্য তাঁর খ্যাতি রয়েছে। সাইমন মেটাফ্রাস্টাসের রচনাবলী সাধু-সন্ত ও মহাত্মাদের জীবন কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

এরেথাস ছিলেন কটিয়াসের ছাত্র। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। তিনি নিজ উদ্যোগে প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের অনেক রচনা নকল করেন। এর মধ্যে রয়েছে প্লেটো ও ইউক্লিডের গ্রন্থসমূহ।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বাইজেন্টাইন পণ্ডিতদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী, যদিও সমসাময়িক আরবদের তুলনায় এটা ছিল খুবই সামান্য। সাম্রাজ্যের প্রথম দিকেই অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন দি গ্রামারিয়ান, ইটিয়াস এবং ট্রালেসের আলেকজাণ্ডার ছিলেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিদ। জন দি গ্রামারিয়ান ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী, তৎকালে প্রচলিত গতি ও মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বের ভ্রান্ত তিনিই প্রথম বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু যে বস্তুর জড়ত্ব (**inertia**) সম্বন্ধে তিনি ধারণা করতে পেরেছিলেন, তা নয়, পরন্তু কোন বস্তুর পতনের গতি উক্ত বস্তুর ওজনের উপর নির্ভরশীল—এরিষ্টটলের এ ভ্রান্ত তত্ত্বকেও তিনি খণ্ডন করেছিলেন; এবং শূন্যতা সৃষ্টি অসম্ভব একথা মানতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন।

www.pathagar.com

ইটিয়াস ছিলেন সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের দরবারের চিকিৎসক। তিনি এবং ট্রালেসের আলেকজাণ্ডার উভয়েই প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের অনুসারী ছিলেন। ইটিয়াসের অবদান ছিল বেশী মৌলিক। তিনিই প্রথম ডিপথিরিয়া রোগের বিবরণ প্রদান করেন এবং চক্ষুরোগ সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা ছিল ঐ সময় পর্যন্ত প্রকাশিত বিবরণসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে প্রায় কয়েকশত বছর পর্যন্ত বাইজেণ্টাইনে আর কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়নি। দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সম্রাট সপ্তম কনষ্টাণ্টাইন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রধানতঃ মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে বাইজেণ্টাইনের বিজ্ঞান চর্চা পুনরায় আরম্ভ হয়; পরবর্তী-কালের অন্যতম বৈজ্ঞানিক ছিলেন সিমন সেথ। তাঁর অবদান ছিল চিকিৎসা-বিদ্যায়। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব ছিল: চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিধান প্রণয়ন। এতে তিনি ভারতীয় ও আরব বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন ঔষধের বিবরণ প্রদান করেন।

ইউরোপের ইতিহাসে বাইজেণ্টাইন পণ্ডিতদের অবদান অপরিসীম। প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানভাণ্ডার তাঁরা সংরক্ষণ করতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তী-কালে ইউরোপীয়রা এই জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনষ্টাণ্টিনোপলের পতনের পরে বাইজেণ্টাইনের গ্রীক পণ্ডিতগণ ইতালীতে পালিয়ে যান। ইটালীর রেনেসাঁর পশ্চাতে এ পণ্ডিতদের অবদান অন্য কারও চেয়ে কম ছিল না।

বাইজেণ্টাইনের বিশ্বজোড়া খ্যাতির অন্যতম কারণ এর শিল্পকলা। হেলেনীয় শিল্প, প্রাচ্যদেশীয় শিল্প ও খৃষ্টান শিল্প—এই তিনের সংমিশ্রণে তৈরী বাইজেণ্টাইনের শিল্প। এই শিল্প সৃষ্টির পশ্চাতে শুধু সৌন্দর্যানুভূতিই ছিল না, এটা ছিল বাইজেণ্টাইন সমাজের প্রতিচ্ছবি। ধর্মীয় জীবনের প্রতি নিষ্ঠা, বিশেষতঃ ইহলৌকিক জীবনের প্রতি প্রচণ্ড বৈরাগ্য বাইজেণ্টাইনের জনগণের একটি বিরাট অংশের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল; ফলে, ভাস্কর্যশিল্প, যার মধ্যে মানব সৌন্দর্যের প্রাধান্যই মূল উদ্দেশ্য, তা বাইজেণ্টাইনের শিল্পকলায় কোন পায়নি। বাজজেণ্টাইনের প্রধান শিল্প

www.pathagar.com

ছিল স্থাপত্যশিল্প, যার মধ্যে মূর্ত হয়েছিল একটি ভাববাদী ও মরমী রূপ।

বাইজেন্টাইনের সর্বত্র এই স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন বর্তমান। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কনষ্টান্টিনোপলের সান্টা সোফিয়া চার্চ। সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের উদ্যোগে প্রায় ১০,০০০ লোকের পাঁচ বছরের পরিশ্রমে এটি তৈরী হয়েছিল। এর প্রধান শিল্পী ছিলেন মাইলেটাস-এর ইসিডোরাস এবং ট্রালেসের এথেমিয়াস। রোমান স্থাপত্যের পরিকল্পনায় ও বাইজেন্টাইন স্থাপত্যের অলঙ্কারে সমৃদ্ধ এ সৌধটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প। মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য বা ইহলৌকিক কামনা বাসনাকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধুমাত্র অন্তরের সমৃদ্ধি ও আত্মার উন্নতি যে প্রতিটি ধার্মিক খৃষ্টানের একান্ত কাম্য—তা প্রকাশ করা হয়েছে এ সৌধটির মধ্য দিয়ে, যার জন্য এ প্রাসাদটির বহিঃসৌন্দর্যের দিকে কোন নজর না দিয়ে অভ্যন্তর ভাগ অলঙ্কৃত করা হয়েছে অপরিসীম শিল্প-সৌন্দর্যে।

বাইজেন্টাইনের চিত্রশিল্পেরও বিশিষ্ট খ্যাতি রয়েছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য, রঙ ও তুলির আশ্চর্য ব্যবহার ও বর্ণনার অপূর্ব ভঙ্গি—এ খ্যাতির অন্যতম কারণ। এ ছাড়া রয়েছে অলঙ্কার-শিল্প, কারুকার্যময় রেশম-শিল্প ও হাতির দাঁত ও ধাতব শিল্প। এগুলির প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে বাইজেন্টাইনের অপূর্ব শিল্প সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে।

বাইজেন্টাইন সভ্যতার আর একটি বিশেষ অবদান এর সঙ্কলিত আইন-সমূহ। রোমান আইনের সঙ্কলন ও পরিমার্জন করে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এই সঙ্কলিত আইনসমূহের নাম **Corpus Juris Civilis**। এই সঙ্কলন তৈরীর কাজে তিনি ট্রিবোনিয়ানের নেতৃত্বে একদল সুশিক্ষিত আইনবিদকে নিযুক্ত করেন। চোদ্দ মাস কঠোর পরিশ্রমের পর এই আইনগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। **Corpus Juris Civilis** চার অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ **Code** দশটি খণ্ডে সমাপ্ত। এতে রয়েছে সম্রাটের নির্দেশাবলী ও সিনেটের উপদেশসমূহ। দ্বিতীয় খণ্ড **Institutes**-এ আছে রোমান আইনের মূল নীতিসমূহ। প্রধানতঃ আইনের ছাত্রদের জন্য এটি প্রণীত হয়। তৃতীয় অংশের নাম **Digest** বা **Pandects**। এই অংশে আছে

www.pathagar.com

অন্যান্য দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইনসমূহ যা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিখ্যাত আইনবিদদের অভিমতগুলিও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চতুর্থ অংশের নাম Novels। এটি গ্রীক ভাষায় রচিত। জাষ্টিনিয়ানের নিজস্ব আইনগুলি এই অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। Corpus Juris Civilis শুধুমাত্র রোমান আইনের জটিলতাই দূরীভূত করেনি, আইনগুলিকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধরূপে সংকলিত করেছে।

বাইজেণ্টাইন সভ্যতার বিকাশের কারণ

প্রবল পরাক্রমশালী রোম সাম্রাজ্য যখন আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে এবং বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, ঠিক সে সময়ে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য কি ভাবে সভ্যতার শিখরে আরোহণ করল, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে এ দুই সভ্যতার অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করা দরকার।

যে কোন সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত হচ্ছে তার বৈষয়িক উৎপাদন, যার মাত্রা স্থিরীকৃত হয় তৎকালীন কৃৎকৌশলগত আবিষ্কারসমূহ ও তার প্রয়োগ দ্বারা। সে দিক দিয়ে বিচার করলে গ্রেকো রোমান সভ্যতার থেকে বাইজেণ্টাইন সভ্যতার কৃৎকৌশলগত ভিত্তি খুব যে ভিন্নতর ছিল তা নয়। উপরোক্ত সব কয়টি নগরভিত্তিক সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল তাম্র-প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহ যুগের বিভিন্ন কৃৎকৌশলগত আবিষ্কারসমূহকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু যে কোন সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য সমাজের মানুষদের মধ্যে কতগুলো সামাজিক সম্পর্কের ও উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হয়, কারণ উৎপাদনকারীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ভিন্ন কোন উৎপাদন ব্যবস্থা চলতে পারে না। উক্ত উৎপাদন সম্পর্ককে কার্যকরী করার জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক ভাবাদর্শ প্রচলনেরও প্রয়োজন হয়। প্রচলিত সামাজিক

www.pathagar.com

সম্পর্কের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সমাজের সদস্যদের মনে বিশ্বাস, আস্থা ও প্রত্যয় উৎপাদনই এই ভাবাদর্শের কাজ।

উৎপাদন ব্যবস্থা যতদিন অনুন্নত ছিল উৎপাদন সম্পর্ক ততদিন ছিল প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের পক্ষে নির্যাতনমূলক। ব্রোঞ্জযুগের কৃৎকৌশলগত ভিত্তি এতই নিম্নমানের ছিল যে দাস শ্রমের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া এ যুগের সভ্যতা টিকতেই পারত না। কিন্তু সমাজে দাসের উপস্থিতি অর্থনৈতিক বিকাশ এবং কারিগরী আবিষ্কারের জন্য কোন সামাজিক প্রেরণা সৃষ্টি করত না। অপরদিকে প্রাথমিক উৎপাদনকারী দাস ও অর্ধ-দাসদের ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কুচিত থাকার ফলে অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগও ছিল না। এই মূল অসঙ্গতির দরুনই প্রাচীনকালের কোন সভ্যতাই স্থায়ী হয়নি। উৎপাদন ক্ষেত্রে এই মূল অসঙ্গতির তাড়নাতেই ব্রোঞ্জ যুগে দেখা দিয়েছিল সাম্রাজ্য নিয়ে হানাহানি। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ মূল সঙ্কটের সমাধান করতে পারেনি, বরং ধ্বংসের মাধ্যমে লোকক্ষয় ও সম্পদহানি ঘটিয়ে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার পতনকে ত্বরান্বিতই করেছিল। বাস্তবিকই ব্রোঞ্জযুগের শেষ দিকে সভ্যতার পরিধি নিদারুণভাবে কমে গিয়েছিল।

লৌহযুগে নতুন কারিগরী আবিষ্কারের ভিত্তিতে নতুন লৌহযুগীয় সভ্যতার উদয় হয়েছিল। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা তারই পরিণত রূপ। কিন্তু গ্রীক ও রোমান যুগের এই সভ্যতাও ছিল দাসভিত্তিক। অথচ খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আয়োনীয় যুগে এবং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত হেলেনীয় ও আলেকজান্দ্রীয় যুগে যে সকল কারিগরী আবিষ্কার ও উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার ভিত্তিতে স্বাধীন শ্রমভিত্তিক অর্থনীতি নির্মাণ করা সম্ভব ছিল; কিন্তু এর পক্ষে বড় বাধা ছিল তৎকালে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক ও ভাবাদর্শ।

গ্রেকো-রোমান যুগে প্রাথমিক উৎপাদন এবং দৈহিক পরিশ্রমের কাজ দাসদের দিয়ে করান হত বলে স্বাধীন নাগরিকগণ সকল পরিশ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখত। ফলে, দাসযুগের ভাবাদর্শ সমাজের একটি বড় অংশকে, স্বাধীন জনগণকে, কার্যতঃ উৎপাদনমূলক কাজ থেকে বিরত রেখে অর্থনীতির

www.pathagar.com

ক্ষতি সাধন করেছিল। গ্রেকো-রোমান যুগে মুদ্রাভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নির্ভর অর্থনীতিকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের। কিন্তু দাসতন্ত্রের ফলে তা কখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। দাসতন্ত্রের সমর্থনে সৃষ্টি হয়েছিল মানবতা-বিরোধী তত্ত্বকথার (এ্যারিষ্টটলের স্বাভাবিক দাস তত্ত্ব, ইত্যাদি)। গ্রেকো রোমান জগতে যে বিশ্বজনীন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছিল, সে চাহিদা পূরণ করতে পারত খৃষ্টধর্ম। কিন্তু খৃষ্টধর্মের মানবতা ও বিশ্ব-প্রেমের আদর্শ ছিল দাস সমাজের পরজাতি বিদ্বেষ ও মানববিদ্বেষের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণেই রোমান আমলের শেষ দিকে খৃষ্টধর্মকে নির্মম-ভাবে দমন করার চেষ্টা হয়েছিল।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ দুটি : এক, অর্থনীতিতে অনাবশ্যক দাসশ্রমের উপস্থিতি; দুই, একটি অসমঞ্জস, অকেজো ভাবাদর্শ—দাসতান্ত্রিক ভাবাদর্শ। এ ভাবাদর্শ, এ সামাজিক সম্পর্ক মুদ্রানির্ভর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনাকে ব্যহত করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের এই হল মূল কারণ। এ কারণ দুটো দূর করতে পারলে তৎকালীন কারিগরি আবি-ষ্কার সমূহের ভিত্তিতেই নতুন নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ সম্ভব ছিল। বাইজেন্টাইন সভ্যতার বিকাশ তার বাস্তব প্রমাণ। বাইজেন্টাইন সমাজে সংগঠিত দাসতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং কনষ্টান্টাইন কর্তৃক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ এবং থিওডসিয়াস কর্তৃক খৃষ্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি দান রোমান সাম্রা-জ্যের পতনের মূল কারণকে দূরীভূত করেছিল। এরই ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব হয়ে ছিল প্রাচীন এবং গ্রেকো-রোমান যুগের উৎপাদন প্রথাকে অবলম্বন করেই সু-উচ্চ সভ্যতা গড়ে তোলা।

বাইজেন্টাইন সভ্যতার অবসান

পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ছিল ধন-বৈভবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্প সৌন্দর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর

www.pathagar.com

পর থেকে শুরু হয় পতন। এর পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে বাইজেণ্টাইন সভ্যতা মূলতঃ ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগের কারিগরি আবিষ্কারসমূহকে অবলম্বন করেই বিকাশ লাভ করেছিল এবং প্রাচীন উৎপাদন প্রথা ও ভাবাদর্শের সংস্কার সাধন করে তার ভিত্তিতে স্থিতিশীল বাইজেণ্টাইন সমাজ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এ সমাজ যে চিরস্থায়ী হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য, কারণ ঐ অনুন্নত কারিগরি ভিত্তির উপর নির্মিত সমাজের পক্ষে (সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপোষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। ফলে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যকে দুটো পন্থার আশ্রয় নিতে হয়েছে—যুগসঞ্চিত ধনভাণ্ডার থেকে ব্যয় এবং প্রাথমিক উৎপাদনকারী অর্থাৎ কৃষক ও কারিগরদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ। কিন্তু এ পন্থায় সাময়িক ফল পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত এটাই তার ধ্বংসেরও কারণ হয়েছিল। কৃষক ও কারিগরদের দমনের ফলে পণ্যের আভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। কৃষকদের অবদমিত রাখার ফলে বাইজেণ্টাইনের সামরিক শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কারণ ভূমিদাসদের সেনাবাহিনীতে নেয়া হত না এবং দরিদ্র কৃষকদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার মত ক্ষমতা ছিল না। রাষ্ট্র সংগঠনের ক্রমাবনতির ফলে রাজকীয় নৌবাহিনীও বিপুলভাবে অবহেলিত হয়েছিল এবং এই অক্ষম নৌবাহিনী শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য সুবিশাল রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি; এবং নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যে স্থানীয় ভিত্তিক সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে দুর্বল করে তুলেছিল। অথচ এ সামন্ত ব্যবস্থা ছিল পশ্চিম ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে নিকৃষ্ট। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে ইউরোপে ক্রমে ক্রমে যে সামন্ত অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল তাকে কোন বিশাল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রযন্ত্রের ভার বহন করতে হয়নি, তার প্রয়োজনও ছিল না। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য যখন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য

www.pathagar.com

অবিরাম বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যস্ত থেকেছে তখন ইউরোপ, বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে ম্যানর অর্থনীতির ভিত্তিতে সুদৃঢ় অর্থনীতি গড়ে তুলেছে এবং নির্মাণ করেছে পরবর্তী বিকাশের ভিত। সামন্ত ইউরোপের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত সম্পদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ইতালির বাণিজ্যজগৎ। মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপের নতুন নতুন কারিগরি ও অন্যান্য আবিষ্কারের (যথা, অশ্বসজ্জা ও লোহার খুর, হাল ও কম্পাস, বারুদ, কাগজ ও ছাপাখানা প্রভৃতির) প্রচলনের ফলে যেমন ইউরোপীয় অর্থনীতির রূপান্তর ঘটেছিল, রক্ষণশীল বাইজেন্টাইন সমাজে তেমন হয়নি। ইউরোপের দৃঢ়ভিত্তি অর্থনীতির প্রতিযোগিতা তাই বাইজেন্টাইনকে শক্তিহীন করেছিল।

তদুপরি, অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে পরিচালনা করার উপযুক্ত বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্রকে বজায় রাখা যখন ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠেছিল, সে অবস্থায় ক্ষয়িষ্ণু, দুর্নীতিপরায়ণ, বিলাসী আমলাতন্ত্রের হাতে পড়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল। শিল্পোৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শেষ অবধি বাইজেন্টাইন শিল্পের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিরন্তর করবৃদ্ধি জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দেশের চরম অর্থনৈতিক দুর্দিনেও সম্রাটদের বিলাসিতা ও তাঁদের আমলাদের সীমাহীন ব্যয়বাহুল্য এতটুকুও কমেনি। আভ্যন্তরীণ কারণে অবক্ষয়িত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত ইউরোপের নবোদিত বাণিজ্য শক্তির প্রতিযোগিতা এবং বৈদেশিক আক্রমণের আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারল না। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কীদের আক্রমণের ফলে এশিয়া মাইনরের কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায়। দশম শতাব্দীতে নর্মানদের আক্রমণের ফলে থিব্‌স্‌ ও করিন্থ্‌-এর রেশম শিল্প কারখানাগুলি সিসিলি দ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। এর পরপরই সংঘটিত হয় প্রথম তিনটি ক্রুসেড যার ফলে সিরিয়ার বাণিজ্য পথগুলি কনষ্টান্টিনোপলের হাত থেকে ইতালীর দখলে চলে যায়। বাইজেন্টাইন

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের বণিজ্য পথগুলির উপর ইতালী বহুদিন যাবৎ লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, ইতালির বণিক দল কর্তৃক এই বাণিজ্য পথগুলি দখলের চেষ্টা ক্রুসেডের পশ্চাতে অন্যতম প্রধান কারণ। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় ক্রুসেডারগণ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করে সমগ্র নগরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। নাগরিকদের হত্যা করে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়েই ক্রুসেডাররা ক্ষান্ত হয়নি, তারা নগরের গ্রন্থাগার ও দলিলপত্র সংরক্ষণাগারগুলিকেও পুড়িয়ে দেয়। সুন্দর সুন্দর ইমারতগুলি তারা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলে এবং সান্তা সোফিয়া চার্চে রক্ষিত বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পের নিদর্শনগুলিও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। ধর্মোন্মাদ ক্রুসেডারদের হাতে বাইজেন্টাইন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার এরূপ নিদারুণ পরিণতি ঘটল। ক্রুসেডারগণ এরপর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেখানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এ শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কনষ্টান্টিনোপলে কিছু কাল পরে পুনরায় বাইজেন্টাইন সম্রাটের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। জনগণের কাছ থেকে কর আদায়ও আর সম্ভব হচ্ছিল না। সর্বত্র অরাজকতা যখন এত ব্যাপক ঠিক তখনই অটোমান তুর্কীরা একে একে বাইজেন্টাইনের বিভিন্ন প্রদেশগুলি দখল করে নেয়। অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীদের হাতে কনষ্টান্টিনোপলের পতন হয় এবং সে সাথে বাইজেন্টাইন সভ্যতার চির অবসান ঘটে।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের অবসান

ইউরোপের ইতিহাসে কনষ্টান্টিনোপলের পতন একটি যুগান্তকারী ঘটনারূপেই চিহ্নিত। এর দ্বারা শুধুমাত্র এশিয়া মাইনর ও বল্কান উপদ্বীপে খৃষ্টানদের স্থলে মুসলিমদের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হল না, পরবর্তী দুই শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা জুড়ে তুর্কীদের আধিপত্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হল। এর ফলেই ভূমধ্যসাগরের ইতালীয় বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্যের সুবিধা চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গেল। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য পথ তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার দরুন আরব বণিকদের সাথে ইউরোপীয় বণিকদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। সেই সাথে বন্ধ হল ভারতবর্ষ, চীন ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে বিলাসবহুল পণ্য সম্ভারের আগমন। কিন্তু ইউরোপীয় সামন্ত প্রভু ও সদ্য অধিকার প্রাপ্ত দেশীয় রাজন্যবর্গের জন্য এ সব বিলাস দ্রব্যের চাহিদা এত প্রবল ছিল যে প্রধানতঃ সে জন্যই অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ বিপুল লাভের সম্ভাবনায় মরিয়া হয়ে উঠল প্রাচ্যের দেশগুলিতে গমনের নতুন জলপথ আবিষ্কারের সন্ধানে। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের বণিকগণ যারা এতদিন ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে ইতালীয় বণিকদের সমৃদ্ধি অবলোকন করত তাদের সামনে উপস্থিত হল বিশাল সুযোগ। আর সে সুযোগ সবচেয়ে বেশী পেল পর্তুগাল ও স্পেন। কারণ এরা ছিল আটলান্টিক মহাসাগরীয় দেশ। পর্তুগাল চেষ্টা করল আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে আসার, আর স্পেন অভিযান করল পশ্চিম দিকে। উদ্দেশ্য একই—গোলাকার পৃথিবী পরিক্রমণ করে ভারতবর্ষ বা চীনে পৌঁছান। এ ভাবেই কলম্বাস একদিন আবিষ্কার করলেন নতুন মহাদেশ আমেরিকা। আর ভাস্কো ডা গামা পৌঁছে গেলেন ভারতবর্ষে নতুন আবিষ্কৃত জলপথ দিয়ে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক অভিযান ইউরোপের জনগণের এতকালের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দিয়ে প্রমাণ করল পৃথিবী তাদের

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ম্যানরেই আবদ্ধ নয়—পৃথিবী অনেক বড়। অন্যদিকে বিভিন্ন দেশ দখল করে সারা পৃথিবী থেকে ধনসম্পদ জড়ো করে ইউরোপ তার প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করল এবং ভবিষ্যতের ধনতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করল।

তুর্কী সেনাদের হাত থেকে যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি কোন রূপে প্রাণ নিয়ে কনষ্টান্টিনোপল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সাথে করে কোন ধনসম্পদ আনতে পারেননি বটে, কিন্তু বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ কিছু গ্রীক রোমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন ইতালীতে। ইতালীতে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ। ইতালীর শিক্ষিত জনগণকে এঁরাই পরিচিত করেছিলেন গ্রীক ও রোমান ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের সাথে। প্রধানতঃ এঁদের চেষ্টাতেই সেখানে সৃষ্টি হয় জ্ঞানের জন্য এক বিপুল উদ্দীপনার। হাজার বছর পূর্বের হারিয়ে যাওয়া গ্রেকো রোমান ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য যে বিপুল উৎসাহের জোয়ার এসেছিল ইতালীতে তাকেই বলা হয় নব জাগরণ বা রেনেসাঁ। এ নব জাগরণ শুধু অতীতকে ফিরিয়ে আনা নয়, এ নব জাগরণ এক হাজার বছরের অন্ধকার তমসাকে কাটিয়ে আলোয় উত্তরণ।

দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাচিও'র সাহিত্য, রাফায়েল, দা ভিঞ্চি ও মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকলা এবং কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ভেসালিয়াস, হার্ভের আবিষ্কৃত নতুন বিজ্ঞান ইউরোপকে দেখিয়েছে নতুন পথ, নতুন আলো। সে আলোর পথ ধরেই এগিয়ে গেছে পৃথিবী, পদার্পণ করেছে নতুন যুগে। সে যুগ আধুনিক যুগ।

———

www.pathagar.com